মে দিবস সংখ্যা

মে ২০১৭ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

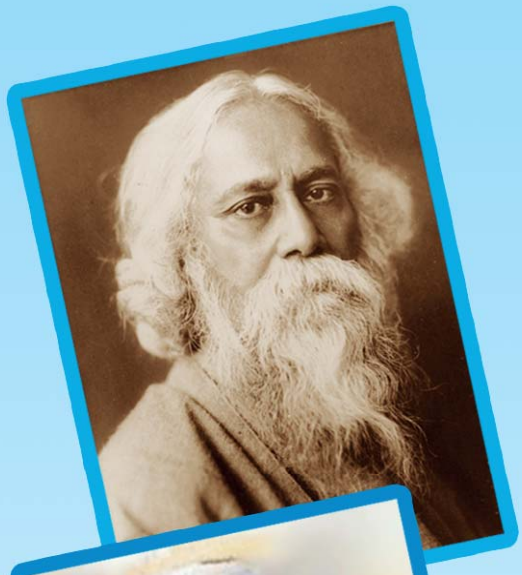

১৯৮১ সালের ১৭ই মে

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

২৫শে বৈশাখ

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা : অতীত ও বর্তমান

১১ই জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি

পয়লা মে

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

মে ২০১৭ ❑ বৈশাখ ১৪২৪ - জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

২৪শে মে ১৯৭২, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় নিয়ে এলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

সম্পাদকীয়

পয়লা মে মহান মে দিবস। শ্রমিক সমাজ ও মেহনতি মানুষের অধিকার ও স্বীকৃতি আদায়ের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে সারাবিশ্বে মে দিবস পালিত হয়। ১৮৬৬ সালের মে মাসে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ, প্রাণ বিসর্জন এবং পরবর্তী ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় আজও বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের মাইলফলক হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলাদেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারিভাবে পালিত হয়। মে দিবস উপলক্ষে নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়ার সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। দেশে ফেরার পরিবেশ না থাকায় তাঁরা বিদেশে অবস্থান করেন। বাংলার মানুষের ভালোবাসার টানে এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শেখ হাসিনা ছয় বছরের নির্বাসন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে জন্মভূমি বাংলাদেশে ফেরেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৪। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী। ১৯৭২ সালে অসুস্থ কবিকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর শানিত লেখনির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হন। তাঁদের স্মরণে একাধিক নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়।

এছাড়া ১৪ই মে বিশ্ব মা দিবস, ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস এবং ৩১ শে মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধসহ এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিষয় স্থান পেয়েছে। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারি পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; **স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

১৭ই মে ১৯৮১: শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

ঐতিহাসিক মে দিবস ৬
কমল চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশ এবং তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা ৮
মাহবুব রেজা

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি ১১
শাফিকুর রাহী

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী প্রাণী ১২
ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

শ্রম পরিস্থিতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ২০
শোহরাব আহম্মেদ

বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চা: অতীত ও বর্তমান ২২
আতিক আজিজ

সর্বকালের নজরুল ২৩
জাকির হোসেন চৌধুরী

বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা ২৪
মো. সালাহউদ্দিন

সাধারণ মানুষের অসাধারণ কবি ৩০
এমরান চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব ৩১
আলী আসিফ খান

১৪ই মে : বিশ্ব মা দিবস ৩৩
আতিকুল বাশার

২৮শে মে: নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস
নিরাপদ মাতৃত্বের ফসল, সুস্থ মা সুস্থ সন্তান ৩৪
সুলতানা বেগম

৩১শে মে : বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ৩৫
বাকী বিল্লাহ

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ৩৭
মোছা. মোবাস্বেরা কাদেরী

প্রথম নারী প্রধান তথ্য অফিসার
নারীর ক্ষমতায়নে মাইলফলক ৩৮
নাসরীন জাহান লিপি

গল্প ৩৯-৪০
একটি সাদা পাঞ্জাবি
শামস সাঈদ

কবিতাগুচ্ছ ৪১-৪৪

মনজুরুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন, মাজেদুল হক, লিলি হক, কামাল হোসাইন, মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান, কনক চৌধুরী, সাঈদ তপু, সমীরণ বড়ুয়া, স্বপন মোহাম্মদ কামাল, রকিবুল ইসলাম, জুনান নাশিত, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, গোলাম নবী পান্না, সাদিয়া সুলতানা, রোকসানা গুলশান, অতনু তিয়াস, আরেফিন রব, বাপ্পি সাহা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৫
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্যমন্ত্রী ৪৭
আমাদের স্বাধীনতা ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৮
উন্নয়ন ৫০
আন্তর্জাতিক ৫১
শিক্ষা ৫১
প্রতিবন্ধী ৫২
স্বাস্থ্যকথা ৫৩
সংস্কৃতি ৫৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৫
কৃষি ৫৫
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৬
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৫৭
জেন্ডার ও নারী ৫৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৯
যোগাযোগ ৬০
নিরাপদ সড়ক ৬০
পর্যটন ৬১
শিল্প-বাণিজ্য ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬২
চলচ্চিত্র ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

১৭ই মে ১৯৮১

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে 'শেখ হাসিনা' নামটি হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ্য প্রতীক। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়ার সময় তিনি ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। রক্তের টান এবং বাংলার মানুষের ভালোবাসার আহ্বানে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ৬ বছরের নির্বাসন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফেরেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা

অতীত ও বর্তমান

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপ্তি শতাব্দী ছাড়িয়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এখানে রবীন্দ্রচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। তার মধ্যেও বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা বন্ধ হয়নি। তারপর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করল। তাঁর গানের বাণী ও সুর, অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ, দুর্দিনে জাতিকে সাহস যুগিয়েছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করে। এরপর রবীন্দ্রচর্চা আগের তুলনায় আরো ব্যাপক, বিচিত্রমুখী ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-২২।

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দেশপ্রেম, মানবপ্রেম আর ধর্মচেতনার নাক্ষত্রীয় আভায় উদ্ভাসিত বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখনি ধারণ করেছিল বাঙালির বীরত্বের অমরগাথা। তিনি বাঙালির শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথা। তাঁর মননে-ধ্যানে-জ্ঞানে লালন করে জানান দিলেন বাঙালির মুক্তি ও বিজয় অনিবার্য। বাঙালির আছে তাবৎ বিশ্বকে শাসন করার শক্তি, সাহস এবং গর্বিত গরিমা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞা, মানবিকতা ও দূরদর্শিতার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় কবির সর্বোচ্চ সম্মানিত আসন অলংকৃত করেছেন নজরুল, যা সমগ্র জাতির কাছে অতীব গৌরবের বিষয়। এর ওপরে বিস্তারিত প্রতিবেদন পড়ুন, পৃষ্ঠা-১১।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী প্রাণী

অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মতো স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে ওদেরও। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাণীদের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানগুলো, যেমন– আবাস এলাকা, খাদ্যের উৎস, বিচরণ ক্ষেত্র, নিরাপত্তা ইত্যাদি ধ্বংস করছি। শুধু শিকারের কারণেই ইতোমধ্যে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে ও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে। মাত্র তিনশ বছরে পৃথিবী থেকে প্রায় তিনশ প্রজাতির মেরুদণ্ডী প্রাণী হারিয়ে গেছে। এ নিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ড. আ ন ম আমিনুর রহমানের বিস্তারিত প্রতিবেদন পড়ুন, পৃষ্ঠা-১২।

বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা

শরীর ও মানস গঠনে খেলাধুলা অপরিহার্য। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কানামাছি, কাবাডি, গোল্লাছুট, বউচি, দাঁড়িয়াবান্ধা, লুডু, এক্কাদোক্কা একসময় বিপুল জনপ্রিয় ছিল। এসব খেলা এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। গ্রামীণ খেলাধুলা নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-২৪।

নিবন্ধ

১৭ই মে ১৯৮১

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর যোগ্য উত্তরসূরি ও স্বপ্ন কন্যার নাম শেখ হাসিনা। আর বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে 'শেখহাসিনা' শব্দগুচ্ছটি হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ্য প্রতীক। আবার শোক ও বেদনা তাঁকে বাংলাদেশের নবযাত্রায় পাথর প্রতিমাসম শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। তিনি বাঙালির চিরায়ত মমতাময়ী আদল পেলেও সত্য ও ন্যায়ের পথে আপোশহীন এক সত্তা।

বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম, নির্যাতন ও আন্দোলন করে বাঙালির হাজার বছরের শেকল ছিঁড়েছেন, আমাদের উপহার দিয়েছেন নতুন দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। তিনি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দেশি-বিদেশি স্বাধীনতার শত্রুদের গভীর ষড়যন্ত্রে তা সফল হয়নি। তাঁকে এবং তাঁর স্বজন ও সহচরদের হত্যার মাধ্যমে সেই পঁচাত্তরে বাংলাদেশের আকাশে কালো মেঘ চেপে বসে। সে আমাদের দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস। এই দুঃখ-বেদনা মুছতে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বিরামহীন সংগ্রাম করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যখন সোনার বাংলা পুনর্গঠনে নিরন্তর সংগ্রামে নিয়োজিত, তখন তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে ছিলেন। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পূর্বে তাঁরা উভয়েই সেখানে গিয়েছিলেন। বিদেশে থাকার কারণেই তাঁরা বিধাতার অসীম করুণায় বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর শেখ হাসিনা ১৬ই মে ১৯৮১ পর্যন্ত ভারতে নির্বাসিত ছিলেন। এদিন তিনি বুকে পাথর বেঁধে স্বদেশে ফিরে আসেন। সতেরোই মে তাই স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের কাছে একটি ঐতিহাসিক দিন। তাঁর ফিরে আসার কারণেই স্বাধীনতায় নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। বাংলার আকাশের কালো মেঘ পালিয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট ও অনিশ্চয়তার বেড়াজাল ডিঙিয়ে তাঁকে পথ চলতে হয়েছে। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর পনেরোটি বছর তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে হয়েছে। মূলত পিতার অসমাপ্ত কাজ এবং দেশের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষু ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এবং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তিনি বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। অবশ্য ১৯৮১ সালের ১৩-১৫ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। তাঁকে ফিরেও আসতে হয় পিতার রক্তের টান এবং বাংলার মানুষের ভালোবাসার অসীম দরদে। বঙ্গবন্ধুর মতো তিনি এদেশের জল-কাদার মানুষ। অধিকারহারা জনগোষ্ঠীর সহায় ও প্রিয়জন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে'র কথা একটু বলি। সেদিন তিনি পুতুল ও জয়কে নিয়ে ইন্ডিয়া এয়ার লাইন্সের ৭৩৭ বোয়িং বিমানে ঢাকার কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিন মানিক মিয়া এভিন্যুতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিমানবন্দর, এভিন্যু ও শেরেবাংলা নগর সেদিন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। শেখ হাসিনার শোকাবহ স্মৃতিবেদনা, জনতার আবেগ আর বিধাতার নির্মল বর্ষণ একাকার হয়েছিল সেই প্রত্যাবর্তনে। সেদিন তিনি বলেছিলেন– 'আমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছু চাওয়া-পাওয়া নাই। সব হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে।

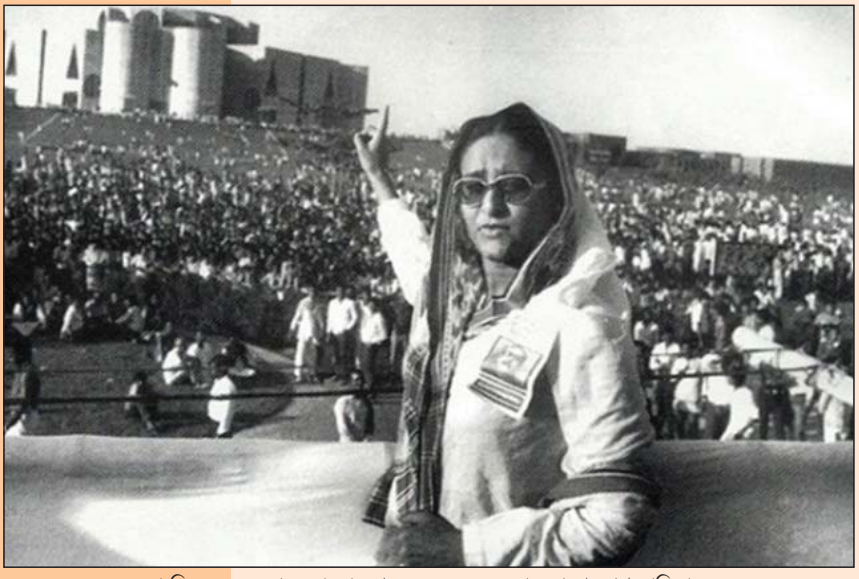

১৭ মে ১৯৮১ দেশে ফিরে এসে শেরে বাংলা নগরে সমবেত জনতার মাঝে শেখ হাসিনা

আপনাদের পাশে থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য।' কান্নাজড়িত সেই কণ্ঠ এখনো আমাদের কানে বাজে এবং হৃদয়কে আপ্লুত করে।

একাশি থেকে ছিয়ানব্বই– এই ষোলো বছর তাঁর নিরন্তর সংগ্রামী কাল। ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথচলা। এরপর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা। এ অভিযাত্রায়ও তিনি শঙ্কাহীন ছিলেন না। তাঁর বাংলার মাটিতে পদার্পণের পর থেকেই বার বার হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। দেশবাসী ও বিশ্ববাসী তা জানে। কিন্তু তাঁর সহায় পরম সৃষ্টিকর্তা এবং বাংলার মানুষ। সকল ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ছিয়ানব্বই-পরবর্তী এক মেয়াদে নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে জোট সরকার গঠন করে। তারপর টানাপড়েন, ওয়ান ইলেভেন সরকার এবং আবার নির্বাচন। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা এবং পাঁচ বছর পর নির্বাচনে জিতে বর্তমান সরকার গদিনসীন।

১৭ই মে ১৯৮১ নির্বাসিত জীবন থেকে বাংলাদেশে ফিরে এলেন শেখ হাসিনা

এখন আমরা হিসাব করতে পারি– শেখ হাসিনা সেই দুর্দিনে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলার মানুষ কী পেয়েছে। আমরা কী অর্জন করেছি। আমাদের প্রাপ্তির পাল্লা কোনদিকে ভারী? বাংলার মানুষ কি সুখে আছে? এসব প্রশ্নের সহজ উত্তর। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া সংবিধান ফিরে পেয়েছি। পার্বত্য সমস্যা সমাধান হয়েছে। একাত্তরের এবং পঁচাত্তরের খুনিদের শাস্তি হয়েছে। সমুদ্রসীমা মামলায় আমরা বিজয়ী হয়েছি। ছিটমহল বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মাতৃভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতি ঘটেছে। পাশাপাশি সুন্দরবন ও মঙ্গল শোভাযাত্রা জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে ঐতিহ্যগত কারণে। আর বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ও পদ্মা সেতুর (নির্মাণাধীন) কথা কে না জানে।

এসব অর্জন ও প্রাপ্তির মূলে ঐ মমতাময়ী মানুষটি। যার নিরলস পরিশ্রমে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের মডেল রাষ্ট্র। আর দেশের মানুষের উন্নয়ন? নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যম আয়ের দেশের সোপানে উন্নীত হওয়া। দেশের সাধারণ মানুষ এখন বোঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ কাকে বলে। গোটা বিশ্বকে প্রযুক্তি এখন ঘরের মধ্যে বন্দি করেছে। কোনো কিছুরই অভাব নেই তাদের। বঙ্গবন্ধু এমনই স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম ও আন্দোলনে।

বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক ও গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রথম সন্তান। শৈশব- কৈশোর অতিবাহিত হয় গ্রামে। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় আসেন। পড়াশোনা করেন গ্রামের পাঠশালা, ঢাকার নারীশিক্ষা মন্দির, ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ, কিছুদিন ইডেন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষা আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে পিতার আগ্রহে বিয়ে করেন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে। সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল তাঁদের ছেলেমেয়ে। একাত্তরে তিনি মায়ের সাথে ধানমন্ডির একটি বাড়িতে বন্দি জীবন কাটান।

দেশ গড়ার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন সাহিত্যের ছাত্রী। তাঁর লেখায় স্বদেশ ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানুষের অধিকার ও উন্নয়ন, আগামীর রূপরেখা ও মানবতাবোধের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

শেখ মুজিব আমার পিতা
কেন তারা পথশিশু
স্বৈরতন্ত্রের উৎপত্তি
যেতে হবে অনেক দূর
আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম
জনগণ এবং গণতন্ত্র
গণমানুষের উন্নয়ন
আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি
সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র
সাদাকালো
সবুজ মাঠ পেরিয়ে ও
মাইলস টু গো, দ্য কোয়েস্ট ফর ভিশন (দুখণ্ডে সমাপ্ত)

একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে শেখ হাসিনার অবদান আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ইতোমধ্যে শান্তি, গণতন্ত্র, দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য পেয়েছেন বহু পদক, জাতিসংঘের সম্মাননা, ডিগ্রি ও উপাধি। তাঁর এই অর্জন ও স্বীকৃতি সমগ্র বাঙালিকে গৌরবান্বিত করেছে। তিনি বাংলাদেশ অন্ধ কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য। আমরা অনেকেই জানি না তিনি মরণোত্তর চক্ষুদান করেছেন।

দিন বদলের অভিযাত্রী এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক শেখ হাসিনা আমাদের স্বপ্ন-ভুবনের এক সাহসী কাণ্ডারী। বিশ্বের বুকে সমৃদ্ধ বাঙালির একমাত্র আলোকবিভা। তাঁর জীবন হোক আরো নন্দিত– এ কামনা সকলের।

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

ঐতিহাসিক মে দিবস

কমল চৌধুরী

মে দিবস বিশ্বের সকল শ্রমিক ও মেহনতি জনতার কাছে এক মহান দিবস হিসেবে বিবেচিত। মে দিবস একই সাথে বেদনার, বিজয় উৎসবের ও সংগ্রামী শপথ নেবার দিন। এর ইতিহাস অনেক পুরনো। পৃথিবীতে বহু আন্দোলন, বিপ্লব, রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু মে দিবসের ঘটনা এমনই আবেদনময় হয়েছিল যে তা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে সাড়া জাগিয়েছিল। বহু বছর পূর্বে শিকাগোর হে মার্কেট স্কয়ারে যে রক্তগোলাপ বিকশিত হয়েছিল তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমন এক সময় ছিল যখন সূর্য ওঠার পূর্বে শ্রমিক কাজ শুরু করত, আর সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে বাড়ি ফিরে যেত। এর বিনিময়ে তাদেরকে কোনোরকম বেঁচে থাকার জন্য অর্থ দেওয়া হতো। তার উপর ছিল অপমান আর বেত্রাঘাত। 'যত পায় বেত, তত পায় না বেতন'–এ ছিল সেই যুগের বিধান। যুগ যুগ ধরে এই অবস্থা চলছিল। অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকার শ্রমিকেরাও রুটি রোজগারের জন্য কেনা গোলামের মতো কাজ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে নিয়ম পালটাতে শুরু করে। শ্রমিকরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তারা ধর্মঘটে শরীক হয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়।

১৬৮৪ সালের দিকে নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম ঠেলাগাড়িওয়ালাদের সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৭৭০ সালে একই স্থানে পিপা প্রস্তুতকারক শ্রমিকেরা ইউনিয়নে সংগঠিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার বছরেই ১৭৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকেরা সর্বপ্রথম ধর্মঘট আন্দোলনের সূচনা করে এবং দাবিও আদায় করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ধর্মঘট আরো জোরদার হয়ে ওঠে। তবে ১৮৪২ সালে 'ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন' গড়ে ওঠে, এটাই বিশ্বের প্রথম ফেডারেশন হিসেবে বিবেচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নিজ নিজ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে থাকে। ১৮৬৪ সালে ব্রিটেনে মার্কস ও অ্যাঞ্জেলস-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের সমিতি'। ইতিহাসে এটাই 'প্রথম আন্তর্জাতিক' নামে খ্যাত। ১৮৬৬ সালের আগস্টে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা আমেরিকার বালটিমোরে মিলিত হয়ে গঠন করেন 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'। এর সভাপতি নির্বাচিত হন মার্কিন শ্রম আন্দোলনের পুরোধা উইলিয়াম এইচ সিভিস। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। এ ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে 'আট ঘণ্টা শ্রমিক সমিতি'। আট ঘণ্টার আন্দোলন সমগ্র আমেরিকায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তার প্রমাণ শ্রমিকদের কণ্ঠে গাওয়া গান 'উই আর সামনিং আওয়ার ফোর্সেস ফ্রম সিপইয়ার্ড/শপ অ্যান্ড মিল/এইট আওয়ার্স ফর হোয়াট উই উইল ফর রেস্ট/এইট আওয়ার্স ফর হোয়াট উই উইল (কলকারখানা বন্দর থেকে/বাজাই যে রণডঙ্কা/শ্রম-বিশ্রাম আনন্দ সবই/এক একটি আট ঘণ্টা)। ১৮৭০ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে স্থানান্তর করা হয়। যদিও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ অস্তিত্ব শেষাবধি লোপ পায়। ১৮৭৫ সালে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় ১০ জন খনি শ্রমিক ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। এ ঘটনার জের হিসেবে ১৮৭৭ সালে লক্ষ লক্ষ রেল, ইস্পাত ও খনি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। তারা ৩০০ জন সাথিকে হারায়। মালিকপক্ষ এবারও জয়ী হয়। কিন্তু সংগ্রামের কাফেলা থামেনি। এগিয়ে চলেছে সামনে, আরো সামনে। অতঃপর ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর আমেরিকার 'ফেডারেশন অব লেবার' সুদীর্ঘ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ক্ষণে ঘোষণা করে, ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় গণ্য করা হবে।

এল পয়লা মে, শনিবার। সারা আমেরিকায় যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল শিকাগো। ১লা মে'র আগের রবিবারে শিকাগো শহরে ২৫,০০০ শ্রমিকের এক বিরাট জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ১লা মে হাজার হাজার শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটে অংশ নেয়। মিশিগান এভিনিউ'র চত্বরে বিশাল শ্রমিক জমায়েত এবং স্লোগান সমৃদ্ধ মিছিল লেক ফ্রন্টে শেষ হয়। শ্রমিক শ্রেণির সংহতিকে শোষক শ্রেণি সুনজরে দেখতে পারেনি। এতদিনের অনুগত শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ২রা মে ছিল রবিবার ছুটির দিন, আলবার্ট আর পার্সনস সেদিন সিনসিন্নাটি গিয়ে বক্তৃতা করেন।

১লা মে ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহান মে দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

৩রা মে ম্যাককমিক রিপার কারখানার শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ৬ জন শ্রমিক নিহত এবং অনেকে আহত হয়। ৪ঠা মে এ গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শিকাগোর 'হে মার্কেট স্কয়ারে' বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলছিল শান্তিপূর্ণভাবে। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিকনেতা আলবার্ট আর পার্সনস। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। শেষ বক্তা ফিলডেনের বক্তৃতা শেষে দূর থেকে এসে পড়ল একটা বোমা। আকাশ হলো প্রকম্পিত, নিহত হয় জনৈক পুলিশ সার্জেন্ট। আর সাথে সাথে শুরু হয় পুলিশের গুলিবর্ষণ। এবার কিন্তু শ্রমিকেরাও রুখে দাঁড়ায়। ৪ জন শ্রমিক মারা যায়, ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। হে মার্কেট স্কয়ার রক্তে লাল হয়ে ওঠে। সভায় উপস্থিত এক শ্রমিক তার জামা খুলে ভিজিয়ে নেয় রক্তে। রক্তে ভেজা লাল জামাটি উড়িয়ে দেয় পতাকা হিসেবে। এ পতাকাই আজ শ্রমিক শ্রেণির লাল ঝাণ্ডা– সংগ্রামের বিজয় পতাকা। হে মার্কেট স্কয়ারের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর চলে নির্যাতন। কারাবরণ করে অনেক শ্রমিক। আয়োজিত হয় বিচারের নামে প্রহসন। ১৮৮৬ সালের ২১শে জুন শিকাগোতে বিচার শুরু হয়। আসামি ছিলেন অগাস্ট স্পাইজ, জর্জ অ্যাঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিশার, মাইকেল স্কয়ার, সাম ফিলডেন, লুইস লিংগ ও অস্কার নীবে। পার্সনস তখন পলাতক, কিন্তু বিচারের প্রথম দিনে আদালতে সহসা হাজির হলেন পার্সনস। অপর নেতা স্পাইজ আদালতে বলেছিলেন, অভাবে ও কষ্টে খেটে খাওয়া লাখো লাখো নিষ্পেষিতরা যে আন্দোলনে তাদের মুক্তির আশা দেখে– তোমরা যদি ভেবে থাক যে, আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেই শ্রমিক আন্দোলনকে উচ্ছেদ করতে পারবে, যদি এটাই তোমাদের মত হয় তবে দাও আমাদের ফাঁসি। যেখানে একটা স্ফুলিঙ্গের উপর পা দেবে সেখান থেকেই তোমাদের পেছনে-সামনে-সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে লেলিহান অগ্নিশিখা। এটা ভূগর্ভের আগুন, তোমরা তা নেভাতে পারবে না। ১৮৮৬ সালের ৯ই অক্টোবর এ প্রহসন বিচারে শ্রমিক নেতাদের মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়। সকল জনমতকে উপেক্ষা করে ১৮৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয় ৪ শ্রমিক নেতাকে। আলবার্ট আর পার্সনস, অ্যাডলফ ফিশার, জর্জ অ্যাঞ্জেল ও অগাস্ট স্পাইজ। মাইকেল স্কয়ার, সাম ফিলডেনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং লুইস লিংগ ও অস্কার নীবেকে জেলের বন্ধ কামরায় মৃত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু জেল-জুলুম আর ফাঁসি দিয়ে আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা যায়নি। পৃথিবীর সকল শ্রমিক এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। স্পাইজের উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। প্রতিবছর ১৪ই জুলাই 'ফরাসি বিপ্লব' দিবস পালন করা হয়। এই দিনে ঐতিহাসিক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে। ১৮৮৯ সালে ছিল বাস্তিল দুর্গ পতনের একশ বছর। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সমবেত হন বিশ্বের ৪৬৭ জন শ্রমিক প্রতিনিধি। গঠিত হয় 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'। আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসেই ১লা মে'কে 'মহান মে দিবস' রূপে, শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৮৯০ সাল থেকে আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রমিকেরা প্রথমবারের মতো 'মে দিবস' পালন করে। পরবর্তীতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। তাই ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। এটা কোনো একটি বিশেষ দেশ বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই আন্দোলনের স্বীকৃতি মেলে ১৯৯৯ সালে ত্রিপক্ষীয় সংগঠন আইএলও প্রতিষ্ঠার পর। পঞ্চম কনভেনশনেই প্রস্তাব প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে কাজের সময়কে নিয়ে। যার ফলে বিশ্বের শতাধিক দেশ উক্ত ১নং কনভেনশন অনুসমর্থন করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়ন করে।

কর্মরত শ্রমিক

বাংলাদেশে মে দিবস

এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাধীনতা অর্জনের আগে মে দিবস পালন শুরু হয়। ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম মে দিবস পালন করার কথা জানা যায়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় ১৯২৭ সালে প্রথমবারের মতো মে দিবস পালিত হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে। ১৯৪৭ সালের আগেও সীমিত পরিসরে মে দিবসের সমাবেশ, মিছিল বা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম পাকিস্তানে মে দিবস পালিত হয় ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে। কারণ তখন চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়ন মে দিবসের একটি সভা প্রকাশ্যে করে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মে দিবস সীমিত পরিসরেই পালিত হয়। ১৯৫৩ সালে পল্টনে মে দিবসের জমায়েত হয়। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি প্রথমবারের মতো বিপুল উৎসাহে দিনটি পালন করে। আদমজীতে ৩০ হাজার শ্রমিক লাল পতাকা নিয়ে সভা ও মিছিলে অংশ নেয়। অতঃপর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত মে দিবস বেশ বড়ো আকার ধারণ করে। এ সময় ১লা মে'তে ছুটি প্রদানের দাবি ওঠে। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মে দিবস পুনরায় সীমিতভাবে পালিত হয়। শ্রমিকদের ভেতর একতাবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। ১৯৬৫ সালে পল্টনে জমায়েত হলেও ১৯৬৬ সালে সভার অনুমতি কতৃপক্ষ দেয়নি। ১৯৬৭ সালে বায়তুল মোকাররমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে নির্ধারিত কর্মসূচি 'মা' নাটক প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মঞ্চস্থ হতে পারেনি। ১৯৬৯ সালে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পতন হলেও সামরিক আইন বলবৎ থাকার কারণে প্রকাশ্যে মে দিবস পালন হয়নি। তবে ১৯৭০ সালে বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো কোনো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মে দিবসের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়। স্বাধীনতার পর বহুল কাঙ্ক্ষিত মে দিবস সরকারি স্বীকৃতি পায় এবং ১লা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। বর্তমানে মে দিবস বাংলাদেশে সরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়। মে দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তথাপি মে দিবস বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটা মহান দিবস এবং একটা জনপ্রিয় দিন। তাই বাংলাদেশে মে দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

লেখক : সাংবাদিক ও সদস্য, জাতীয় প্রেসক্লাব

নিবন্ধ

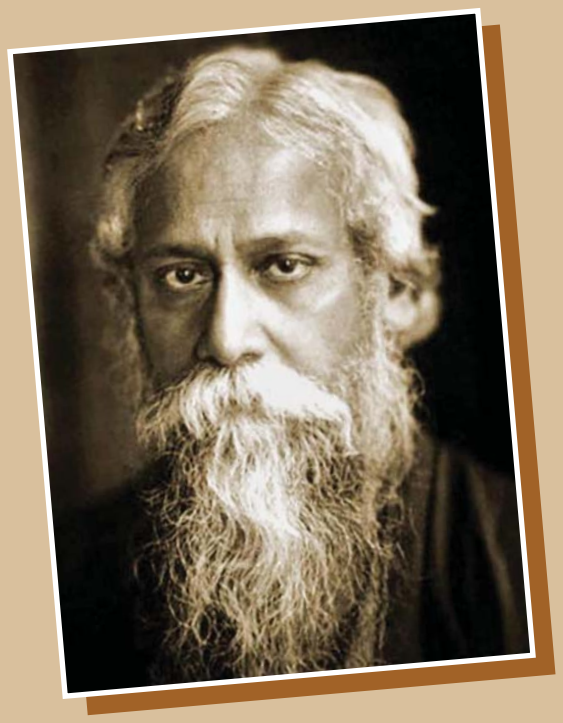

রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশ এবং তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা

মাহবুব রেজা

রবীন্দ্রনাথের জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্বে ঘুরেফিরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ আর এদেশের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুরৈখিক লেখালেখির জগৎ, সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনাসহ নানা কিছুর সঙ্গে বাংলাদেশ নানাভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে– একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। শাহজাদপুর, পতিসরসহ বাংলাদেশের মনোমুগ্ধকর বিচিত্র প্রকৃতি আর সৌন্দর্য তাঁর লেখায়, স্মৃতিতে, স্বপ্নে, ভাবনায়, রঙে, চিত্রকলায় আচ্ছন্ন হয়েছিল।

রবীন্দ্রজীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৮৪০ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নাটোরের রানি ভবানীর জমিদারির অংশ ডিহি শাহজাদপুর ১৩ টাকা ১০ আনায় কিনে নিলে ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত দ্বিতল ভবনটির উত্তরাধিকার পায় ঠাকুর পরিবার। শাহজাদপুরে জমিদারি কেনারও আগে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নওগাঁয় নাগর নদীর পাড়ে পতিসর, কালিগ্রামের জমিদারি কেনেন। জমিদারি হাতবদল হতে হতে এক পর্যায়ে এর দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুরের জমিদারি দেখতে প্রথম আসেন ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে। শাহজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা অন্যরকম নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শাহজাদপুরের সৌন্দর্য, পরিবেশ তাঁকে শুধু মুগ্ধই করেনি, তাঁর লেখালেখিতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এই শাহজাদপুরে তিনি গল্প, কবিতা, গান, নাটক কি-না রচনা করেছেন। *পোস্টমাস্টার*, *ক্ষুধিতপাষাণ*সহ আরো অনেক রচনা এখানে থেকে তিনি লিখেছেন। শাহজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে বহু চিঠি লিখেছেন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাকে লিখেছেন, 'এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব এবং লেখবার ইচ্ছা আসে আর কোথাও না'।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ রবীন্দ্র রচনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কবি নির্দ্বিধায় সেসবের ঋণ স্বীকারও করেছেন। বলা যায়, বাংলাদেশের অপূর্ব রূপবিভা তার লেখার পরিসরকে বিচিত্র ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করেছে। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল এই দশ বছর একটানা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার হুকুম তলব করতে বাংলাদেশে জমিদারি দেখাশোনার কাজে থেকেছেন। এই দশ বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছে নদীতে। পানির মধ্যে থেকে থেকে তিনি এক অদ্ভুত সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছিলেন। নদীকে তিনি বলেছেন 'জলের রানি'। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসর– এই তিন জায়গায় তাঁকে থাকতে হয়েছে কখনো কুঠিবাড়িতে, কখনো বজরা বা বোট 'পদ্মা'য়। তবে কুঠিবাড়ির চেয়ে 'পদ্মা' বোটেই তিনি থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন বেশি। 'চিত্রা' নামেও তাঁর আরেকটি বোট ছিল। নদীর প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা থাকলে তিনি তাঁর বোটের নাম রাখতে পারেন পদ্মা আর চিত্রা, ভাবা যায়!

বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সম্পর্ক। এদেশের মানুষ, মানুষের জীবন তাঁকে নানাভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। এদেশের প্রকৃতিও তাঁকে দুর্বার টেনেছিল। শিলাইদহ থেকে শাহজাদপুর এবং পতিসরে আসা-যাওয়ার সময় তাঁকে অনেকটা সময় নদীর ওপর থাকতে হতো। এসময় তিনি লিখেছেন *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *চৈতালি*, *কণিকা*, *ক্ষণিকা*, *কল্পনা*, *কথা*, *নৈবেদ্য*, *চিত্রাঙ্গদা*, *মালিনী*, *গান্ধারির আবেদন*, *বিদায় অভিশাপ*, *কর্ণ কুন্তী সংবাদ* এবং গল্পগুচ্ছের অনেক গল্প, ছিন্নপত্রের অনেক পত্রও। রবীন্দ্র গবেষকরা তাঁর ছিন্নপত্রের পত্রগুলোকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদনদী ও তার তীরবর্তী মানুষজনের উপাখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অনেক লেখায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী উঠে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে– পদ্মা, যমুনা, গড়াই, ইছামতি, বড়াল, নাগর, বলেশ্বরী, আত্রাই, হুড়ো সাগর প্রভৃতি। শিলাইদহ থেকে শাহজাদপুর ও পতিসরের যাত্রাপথের বর্ণনা উঠে এসেছে তাঁর লেখায়, *'বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে কোলের ইছামতিতে, ইছামতি থেকে বড়লে (বড়ালে), হুড়ো সাগরে, চলনবিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে।'*

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সমস্ত কাজকর্মে বাংলাদেশ সবসময়ই ক্রিয়াশীল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিগুরু তার অনুভবে, সত্তায় বাংলাদেশকে ধারণ করেছেন নিবিষ্টচিত্তে।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বাঙালির একটা নিবিড় যোগ রয়েছে। বাঙালির চিন্তা-চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে দেশমুখীন করেছেন। আবার বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভুবনকে সম্প্রসারিত করেছে– এ কথাও সমানভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ এদেশের লালনের বাউল ধর্মের উদার ও সর্বব্যাপ্ত ভাবনাকে তাঁর বিশ্বমানব ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। রবীন্দ্র চেতনার গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা তাই ব্যাপক ও ব্যাপ্ত। আজ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একান্ত স্বজন, শুধু কবি নন। রবীন্দ্রচর্চার এই ব্যাপকতা, রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার এই আন্তরিকতা ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেও তেমন লভ্য নয়। আমাদের মধ্যে এক প্রবল রবীন্দ্র অধিকারবোধ তৈরি হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথকে আমরা অর্জন করেছি প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতাকে

পরাহত করে'। তাঁরা তাঁদের গবেষণায় বলার প্রয়াস পেয়েছেন, 'আজ যে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত, যে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিয়েছে বাঙালি, সেই ভাষাকে বিশ্বভাষায় অসীম শক্তির ভাষা হিসেবে নতুন প্রাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের গতিপ্রবাহ বিবেচনায় রেখে একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ না হলে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা মধ্যযুগের দেউড়িতেই আবদ্ধ থাকত। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমের তৈরি পথটিকে রাজপথে রূপান্তরিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা কবিতার আবেগ ও ভাষার গীতলতাকে তিনি চূড়ান্ত মানোচ্চতায় পৌঁছে দেন। তিনি সত্য-সুন্দরকে এত চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নিজেই সত্য-সুন্দরের কবি হয়ে উঠেছেন। বাঙালি হাজার বছর ধরেই সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থেকেছে। তারই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে নতুন ও চিরন্তন শিল্পের পথে ধাবিত করেন। তাঁর লেখায় বাঙালির হাজার বছরের প্রেম, আবেগ ও সংগ্রামের শৈল্পিক উত্থান ঘটে। তাই বাঙালি সকল সংকটে হাত বাড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও চিন্তার ভুবনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত বাড়াবার আরেকটি কারণ আত্মশক্তির অন্বেষণ। বাঙালির আত্মশক্তি ও আত্মমুক্তির বাণী রবীন্দ্রনাথের লেখায় লভ্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের সেই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করেছে। প্রবল দেশপ্রেমে ডুবেছিল বাঙালি। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি– বাউল সহজিয়া সুরের এই গানে বিধৃত বাংলার চিরন্তন রূপ মুক্তিসংগ্রামীকে শত্রুর বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেওয়ার সাহস জুগিয়েছে'।

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-প্রাপ্তি, সুখে-দুঃখে, অর্জনে তিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে রয়েছেন– এ এক অলিখিত বন্ধন। বাংলাদেশের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসাও ছিল প্রবল। বাঙালি সব সময় রবীন্দ্রনাথে দায়বদ্ধ ছিল। বাঙালি তার সকল আন্দোলন-সংগ্রামে, সংকটে বিপন্নতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে শক্তি গ্রহণ করেছে। পরম মমতায় তাঁকে বেছে নিয়েছে। দেশভাগ থেকে শুরু করে আমাদের ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, অসহযোগ শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধ– সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শক্তির উৎস হয়ে উঠেছেন নিজ গুণে ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পকার হিসেবে, কবি হিসেবে, নাট্যকার হিসেবে, ঔপন্যাসিক হিসেবে, প্রাবন্ধিক হিসেবে, ভ্রমণকাহিনিকার হিসেবে বাঙালি হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। এর বাইরেও তাঁর হরেকরকম পরিচয় ছিল। ভাবুক ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন, সুরকার ছিলেন, গীতিকার ছিলেন, অভিনেতা ছিলেন, ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক–সেইসঙ্গে আরো অনেক রকমের পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তিনি কি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন? তাঁর মধ্যে যে তীব্র বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানমনস্ক এক মন ছিল তা আমরা কজন জানি?

একটু পেছনে ফিরে যাওয়া যাক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জন্মের কিছুকাল পর থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে অর্থাৎ জীবনের নানা ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটতে লাগল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ঘটে যায় শিল্প বিপ্লব। স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার এবং তা ব্যাপকভাবে চালু হলে মানুষ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যেতে সক্ষম হলো। তাদের কাছে দূরত্ব আর দূরত্ব থাকল না। যোগাযোগের নিবিড়তা মানুষকে একে অন্যের কাছে নিয়ে গেল। চিন্তার সমন্বয় হলো। এরফলে মানুষের বিকাশ সর্বোপরি সভ্যতার বিকাশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে ডারউইনের নানাবিধ আবিষ্কার বিশেষ করে তাঁর অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর এক পরিবর্তন এনে দেয়। একই সময় রসায়ন বিদ্যায় নানারকম উদ্ভাবন, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার এবং জীবাণুতত্ত্বসহ নানা আবিষ্কার মানুষের যাপিত জীবনে এনে দেয় এক বিশাল চমক। ঠাকুর পরিবারের কঠোর নিয়মকানুন ও অনুশীলনের মধ্যে পড়ে শিশু রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের নিবেদিত ছাত্র হয়ত হতে পারেননি কিন্তু ঠাকুর বাড়ির পাঠশালায় তাঁকে পড়াশোনা করতেই হতো। না করে উপায় আছে? ঠাকুর বাড়ির গৃহশিক্ষকদের ফাঁকি দেওয়া চারটেখানি কথা নয়। এখানে তাঁকে পড়তে হতো গণিত, ভূগোল, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যার কঠিন সব পড়া। সাহিত্যের পাঠ নিতে হতো মেঘনাদবধ কাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা জানতে পারি, কঙ্কাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানবদেহের খুঁটিনাটি শেখাতেন এক পণ্ডিত। শুধু তাই-ই নয় মানবদেহের বৈজ্ঞানিক পাঠ নেওয়ার জন্য মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের লাশকাটা ঘরে যেতে হতো ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও। সে থেকে বিজ্ঞানের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পরবর্তী সময়ে এক লেখায় রবীন্দ্রনাথ সেকথার উল্লেখও করেছেন বেশ মজা করে, 'সপ্তাহে একদিন রবিবার সীতানাথ দত্ত (ঘোষ) মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতি

কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কৃষক প্রজাদের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কালো আলখেল্লা পরা)

বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যে রবিবার সকালে তিনি আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না' (জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা-৪১)।

পিতার সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন সেটা তখন তাঁর বিজ্ঞানচর্চার ক্লাস হয়ে উঠত। পিতা তাঁর বালককে পাহাড় দর্শন, পাহাড়ে বেড়ানোর পাশাপাশি তাঁর প্রতিটি সন্ধ্যাকে পরিণত করতেন জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহারিক ক্লাস সেশনে। জ্যোতির্বিদ পিতা-পুত্রকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সন্ধ্যাবেলায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে নক্ষত্রমণ্ডলীর গ্রহ-নক্ষত্রদের চিনিয়ে দিতেন। জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি পিতার কাছ থেকে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারগুলোর বিষয়েও পাঠ নিতেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ধারণা নিয়েই তিনি ১৮৭৩ সালে বারো বছর বয়সে লিখেছিলেন প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা *ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র*। এই লেখাই পরিবারে তাঁকে বিজ্ঞানের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঠাকুর বাড়ি থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য *বালক* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ সে পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিশু-কিশোর উপযোগী লেখা দেবার জন্য নিয়মিত লেখক হিসেবে মনোনীত হন। *বালক* পত্রিকায় বালক কবি প্রায় প্রতি সংখ্যায় লিখেছেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সাধনা* নামে পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ *সাধনায়* প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ে বেশ অনেকগুলো লেখা দিয়েছিলেন। নতুন ইংরেজি শিক্ষিত জনেরা তখন বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সেসব রচনা পড়েও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্বিজ্ঞানের আগ্রহ প্রাণিবিজ্ঞানে সঞ্চারিত হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে চমকে দিয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের গবেষণার বিষয় নিয়ে ১৯০১ সালে *বঙ্গদর্শন*-এ রবীন্দ্রনাথ 'জড় কি সজীব' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা পড়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিস্মিত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, '*তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে*'।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি এক ধরনের ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক লেখায় বলেছেন, 'আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না'।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ জীবনের শুরু থেকেই বিজ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন? না, সেরকম কোনো ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল না। তবে ছোটোবেলা থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ধারায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে পিছিয়ে যেতে হবে। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে পিছিয়ে পড়ে থাকা যাবে না, এগিয়ে যেতে হবে। তাই বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টিকে আজীবন গুরুত্ব দিয়েছেন এর প্রায়োগিক দিকটি মাথায় রেখে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন এবং মানতেন যে, বর্তমান পৃথিবীর উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা–সবকিছুই বিজ্ঞানের হাত ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতেন। তিনি যখন ১৯২৬ সালে ইউরোপের পথে বের হলেন তখন গেলেন জার্মানিতে। সেখানে গিয়ে তিনি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে দেখা করলেন। আইনস্টাইন তখন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করে বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তুলেছেন। সেখানে তিনি আইনস্টাইনের কাছে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা জানতে পারলেন। ফিরে এসে তিনি অনুজ সত্যেন বোসকে খুঁজে বের করেন এবং তার সাথে বিজ্ঞান চর্চায় যুক্ত হন। ৪ বছর পর ১৯৩০-এ আবার তিনি জার্মানিতে যান এবং আইনস্টাইনের সাথে দেখা করেন। এ সময়ই বেতারযন্ত্র, আকাশ বিজয়, তেজস্ক্রিয়া, পরমাণুর গড়ন, ইলেকট্রন-প্রোটন, দু'ধরনের তড়িৎকণা, কোয়ান্টামবাদ, জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য, জীবাণুতত্ত্ব, বংশগতবিদ্যা– এসব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল।

সাহিত্যের মানুষ হয়েও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন কুসংস্কার, গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে না পারলে মানুষকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তিনি মানুষের এই অজ্ঞতা বোধ থেকে তাদের মুক্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান চেতনার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের চিন্তায়, চেতনায় একমাত্র বিজ্ঞানই পারে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি কিংবা বিপ্লব এনে দিতে। তিনি বিজ্ঞান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন এবং তাঁর লেখালেখির পাশাপাশি তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জীবনের বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত ভাবনাকে পরিণত বয়সে এসে এক করে গ্রন্থিত করতে। কবিগুরু তাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটান ১৯৩৭ সালে। তিনি বিশ্বপরিচয় নামে যে প্রবন্ধ সংকলনটি ১৯৩৭ সালে বের করেন তা ছিল মূলত তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ । তাঁর বিশ্ব পরিচয় গ্রন্থের সূচিপত্রটি দেখলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি কতটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই বইয়ের সূচিতে আমরা দেখি তিনি কতটা সুনিপুণভাবে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক– সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের সব বিষয়কেই এক মলাটের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন।

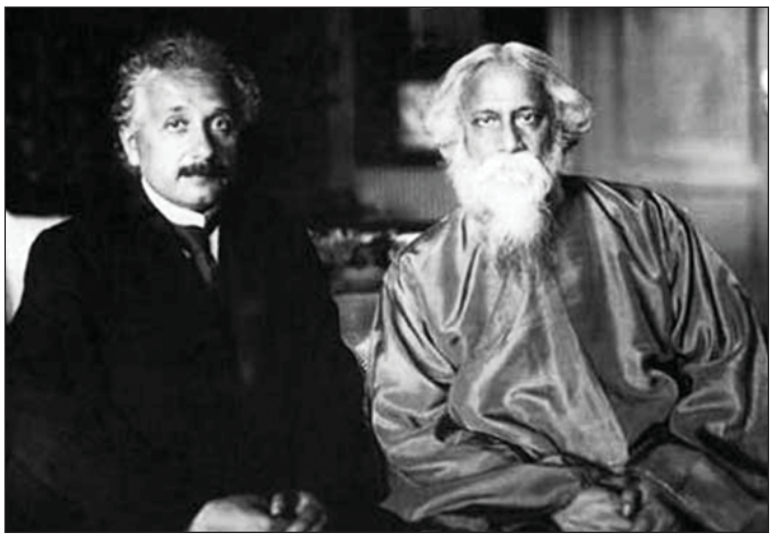

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূলত রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রেখে একটি অগ্রসরমান জাতির পক্ষে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি যে এই বোধটিও বাঙালির মধ্যে জাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন তা আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

বাঙালি হাজার বছর ধরেই সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থেকেছে। তারই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে নতুন ও চিরন্তন শিল্পের পথে ধাবিত করেন। তাঁর লেখায় বাঙালির হাজার বছরের প্রেম, আবেগ ও সংগ্রামের শৈল্পিক উত্থান ঘটে। তাই বাঙালি সকল সংকটে হাত বাড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও চিন্তার ভুবনে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি

শাফিকুর রাহী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দেশপ্রেম, মানবপ্রেম আর ধর্মচেতনায় ফুটে ওঠে বাঙালির মহিমান্বিত বীরত্বের বিরল অমরগাথা। তিনিই বীর বাঙালির আরাধনায় বার বার উচ্চারণ করেছেন, 'বাঙালির মতো অমন বীরের জাতি দুনিয়াতে খুব একটা নেই। কেবল বাঙালিই পারে সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে জয়ের বরমাল্য গলায় পরতে'। তিনি বাঙালির শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথা তাঁর মননে-ধ্যানে-জ্ঞানে লালন করে জানান দিলেন বাঙালির মুক্তি ও বিজয় অনিবার্য। কতকাল ধরে বাঙালিকে শোষণ-পীড়নের জাঁতাকলে অন্যায়ভাবে শাসন করে আসছে ভিনদেশি বর্গি শাসকগোষ্ঠী। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল প্রজ্ঞা, পরম মানবিকতা এবং মহত্তম উদারতার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় কবির সর্বোচ্চ সম্মানিত আসন অলংকৃত করেছেন নজরুল ইসলাম। যা সমগ্র জাতির কাছে অতীব গৌরবের বিষয়। নজরুলের কবিতা আজ বাংলাদেশের রণসংগীত আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদের জাতীয় সংগীত, এসবই হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম আর মানবপ্রেমের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুভলগ্নে– সুনির্দিষ্ট নির্দেশে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-কবিতায় যেভাবে মুগ্ধ হয়েছেন, কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান-কবিতায়ও দারুণভাবে উজ্জীবিত-অনুপ্রাণিত হয়েছেন– বিধায় মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে অমন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের চুরুলিয়ার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও বাংলাদেশের জাতীয় কবি হলেন কীভাবে; সত্যিকার অর্থেই এ তথ্য অনেকেরই না জানার কথা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বড়ো বিনয়ের সাথে অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, 'বিদ্রোহী কবিকে আমাকে দিতে হবে'। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও সাথে সাথে বললেন– হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি চাইলে তা-ই হবে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ওপর বিশ্বাস রেখে বঙ্গবন্ধু সেভাবেই বাংলাদেশ থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুস্তাফা সারওয়ারকে প্রধান করে একটি কমিটি ভারতে পাঠিয়ে দিলেন ১৯৭২ সালের মে মাসে।

ভারতে গিয়ে কমিটির লোকজন সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে কবিকে বাংলাদেশে আনার প্রস্তুতি চলে। ইতোমধ্যে ভারতের নজরুল ভক্তরা বিষয়টি জানতে পেরে তাতে বাধা দিতে চাইল। বাংলাদেশে কবিকে নেওয়া যাবে না বলে তারা সেখানে মিটিং, মিছিল ও প্রতিবাদ শুরু করলে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে সময়সূচিও বদলানো হলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের বেলায় গোপনে বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় কবিকে। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে রাতে কবির ৭৩তম জন্মদিনে বাংলাদেশে এসে পৌঁছলে বঙ্গবন্ধু কবিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে কবির সম্মুখে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। বাকরুদ্ধ কবির অসুস্থতা দেখে বঙ্গবন্ধুর অনেক খারাপ লেগেছিল। কবিও তখন দীর্ঘসময় ধরে অবাক দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এবং বঙ্গবন্ধু না থাকলে কবি নজরুল কখনো বাংলাদেশের জাতীয় কবি হতে পারতেন না।

বাংলা ভাষায় বিদ্রোহী কবি আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদার বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। আজ বাংলাদেশের বড়ো গর্বের ধন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁকে নিয়ে আমরা অহংবোধ করি। কারণ এমন বিদ্রোহী কবি তাবৎ বিশ্বে আর কোথাও জন্মেনি। যেমন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী আলোড়িত, আন্দোলিত। বিশ্ব মানচিত্রে এমন মহান নেতার জন্মে সকল মানুষ গর্ববোধ করে। তাঁর প্রবল প্রজ্ঞা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, সর্বোপরি বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের মুক্তির অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু। বিদ্রোহী কবির চিন্তা-চেতনা আর বঙ্গবন্ধুর বিপ্লবী কণ্ঠস্বর বার বার উচ্চারিত হয়েছে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে। সাম্য ও সম্প্রীতির মহাবন্ধনে সমগ্র মানবজাতিকে এক কাতারে দাঁড় করানোর অঙ্গিকার ঘোষিত হয়েছে তাদের সকল কর্মে ও উচ্চারণে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়– সারা পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত, একটি শোষিত আরেকটি শাসিত। তারা দু'জনই কিন্তু শোষিতের পক্ষেই সবসময় উচ্চকিত ছিলেন।

একজন হলেন বিদ্রোহী ও মানবতার কবি, আরেকজন হলেন দেশপ্রেমী ও রাজনীতির কবি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহী কবি নজরুলের সৃজনশীল মানসকে ধারণ করেছিলেন আর মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন বলেই তো আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল।

একবার বঙ্গবন্ধু কবি নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর এক ভাষণে বলেছেন– 'নজরুল বাঙালির স্বাধীন সত্তার ঐতিহাসিক রূপকার', আমরা যাকে বলে থাকি বাঙালির নব জাগরণের কবি নজরুল। যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উচ্চারণ আর প্রেম-সংগীতের বেলায় গানের 'বুলবুল'। আমরা বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হব আর নজরুলের প্রতিবাদী গান-কবিতায় বাঙালি জাতি জেগে উঠবে, জাগ্রত হবে মানবিক চেতনায়।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

বিশেষ নিবন্ধ

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী প্রাণী

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মতো স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে ওদেরও। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাণীদের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানগুলো, যেমন— আবাস এলাকা, খাদ্যের উৎস, বিচরণক্ষেত্র, নিরাপত্তা ইত্যাদি ধ্বংস করছি। শুধু শিকারের কারণেই ইতোমধ্যে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে ও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়াটা প্রকৃতিরই বিধান এবং তা অনিবার্যও বটে। কিন্তু এতে মানুষের হস্তক্ষেপ পড়লেই তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রকৃতি হয় বিপর্যস্ত ও হারিয়ে ফেলে ভারসাম্য। ডায়নোসর যুগে প্রতি হাজার বছরে মাত্র একটি করে ডায়নোসর প্রজাতি বিলুপ্ত হতো। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। কিন্তু গত মাত্র তিনশ বছরে পৃথিবী থেকে প্রায় তিনশটির মতো মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি হারিয়ে গেছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হিসাব কে-ই বা রাখে?

প্রাণিজগৎকে উপেক্ষা করে মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারে না। কোনো প্রাণী সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তার ভূমিকা ফেলনা নয়। আর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের প্রতি আঘাত হানলে তা ফিরে আসবে মানুষের কাছেই। ফলে এক সময় বিপন্ন হবে মানুষেরও অস্তিত্ব। এক সময় বাংলাদেশ স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, যা এখন শুধু কল্পনা মাত্র। গত একশ বছরে এশিয়ার বিখ্যাত ছোটো এক শিঙ্গী গন্ডার ও দুই শিঙ্গী গন্ডার এদেশের কোথাও দেখা যায়নি। অথচ এক সময় এরা বীরদর্পে এদেশের অরণ্যে বিচরণ করত। আর গত বিংশ শতাব্দীতে প্রাণী হারিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। অনেক পরিচিত প্রাণীই আর এখন দেখা যায় না। তাছাড়া বিপন্ন প্রাণীর তালিকাও তো প্রতিদিন দীর্ঘ হচ্ছে। কে রাখে তার খবর? কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? এখনও যদি এ বিষয়টি অবহেলার চোখে দেখা হয়, তবে যেসব প্রাণী আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকেও আর দেখা যাবে না। বিলুপ্ত প্রাণীর তালিকা হবে আরো দীর্ঘ। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী

নেকড়ে: ধূসর নেকড়ে বা নেকড়ে বাঘ (Grey Wolf, Common Wolf, Tundra Wolf, Arctic Wolf or Mexican Wolf) নামেও

নেকড়ে

পরিচিত। আর্কটিক থেকে তুন্দ্রা বন, প্রেইরি ও শুষ্কভূমিসহ বিভিন্ন ধরনের আবাসে বিচরণ করে। পরিবার বা গোত্র Canidae (ক্যানিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Canis lupus (কেনিস লুপাস)। কুকুর পরিবারের বৃহত্তম এই সদস্যরা একসময় পুরো উত্তরবঙ্গ, যশোর ও খুলনায় বিচরণ করত। ১৯৪৩–৪৪ সালে নোয়াখালীতে শেষ দেখা গেছে বলে জানা যায়। সেসময় একজন লোককে নেকড়ে হত্যা করেছিল বলে রিপোর্ট আছে। মানব বসতির বিস্তৃতি, চামড়ার লোভ গবাদিপশু ও মানবশিশু রক্ষা– এসব কারণে মূলত এদেশ থেকে নেকড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

লেজসহ নেকড়ের দেহের দৈর্ঘ্য ১৫৯–১৬৫ সেন্টিমিটার সেমি., উচ্চতা ৬৬–৮১ সেমি.; ওজন ১৬–৭০ কিলোগ্রাম। দেখতে অনেকটা কুকুরের মতো নেকড়ের লেজ ঝোপড়া ধরনের। দেহের রঙে সাদা, কালো, ধূসর বা বাদামির মিশ্রণ। পিঠের রং সচরাচর গাঢ় হয়, তবে অঞ্চল ও ঋতুভেদে ধূসর, লাল, বাদামি, কালো বা পুরোপুরি সাদাও হতে পারে। পুরুষ নেকড়ে আকারে বড়ো। বাচ্চা নেকড়ে কালচে-বাদামি ও বুকের সামনে একটি সাদা দাগ থাকে।

ডোরাকাটা হায়েনা: ডোরাকাটা হায়েনা, হায়েনা বা নকরা-বাঘ নামেও পরিচিত। গোত্র Hyenidae (হায়েনিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Hyaena hyaena (হায়েনা হায়েনা)। হায়েনার হাসির কথা অনেকেই জানে। এরা যখন রাতে উচ্চস্বরে চিৎকার করে তখন তা হাসির মতোই শোনায়। যতটুকু জানা যায়, একসময় ডোরাকাটা হায়েনা নোয়াখালী, রংপুর ও পুরো রাজশাহী বিভাগ, যশোর, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুরে দেখা যেত। কিন্তু প্রায় শতবর্ষেরও আগে এদেশ থেকে হারিয়ে গেছে।

ডোরাকাটা হায়েনা

হায়েনার দেহের দৈর্ঘ্য ১.০–১.১ মিটার, লেজ ২০ সেমি., উচ্চতা ৬৫–৮০ সেমি. ও ওজন ৩৫–৪০ কেজি। মাথা গোলাকার। মুখবন্ধনী কালো ও চোখা। দেহের সামনের অংশ বেশ সুঠাম ও উঁচু। পেছনের অংশ দুর্বল ও নিচু। সামনের পা পেছনের পায়ের তুলনায় সুঠাম। দেহের লোম ধূসর বা ফ্যাকাশে বাদামি। নিতম্বের দুপাশে ৫-৬টি গাঢ় লম্বালম্বি ডোরা। ঘাড় ও পিঠে লম্বা ও খসখসে পশম কেশরের মতো নেমে গেছে। কান খাড়া। লেজ ঝোপালো। নিশাচর ও ভূচারি; দিনে গর্ত বা গুহায় ঘুমিয়ে কাটায়। গায়ের রং লালচে-বাদমি। গায়ে ও পায়ে আড়াআড়িভাবে তামাটে বা কালচে ডোরা থাকে।

মন্থর ভালুক: মন্থর ভাল্লুক (Stickney Bear, Labiated Bear, Lip Bear or Honey Bear) নামেও পরিচিত। গোত্র Ursidae (উরসিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Melursus ursinus (মেলুরসাস উরসিনাস)। মোটামুটি নিরীহ ও ধীরগতিসম্পন্ন ভালুক প্রজাতিটি

মন্থর ভাল্লুক

১৮৫০ সালে টাঙ্গাইল, শেরপুর, উত্তরবঙ্গ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শিকারের কারণে তখন থেকেই ধীরে ধীরে সংখ্যা কমতে থাকে। পঞ্চাশ বছর আগেও রংপুর–দিনাজপুরের শালবনে দেখা যেত বলে জানা যায়। কিন্তু এরপর থেকেই এদের কোনো চিহ্নও দেখা যায়নি। সে কারণেই আইইউসিএন এদেশে এদেরকে বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করেছে।

বারোসিঙ্গা: বারোসিং বা জলার হরিণ (Swamp Deer) নামেও পরিচিত। গোত্র Cervidae (সারভিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Rucervus duvaucelii (রুসারভাস ডুবাউচেলি)। একসময় পুরো বাংলাদেশ

বারোসিঙ্গা

জুড়ে, বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বন ও সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত ১৯৫৪ সালে এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বারোসিঙ্গার দৈর্ঘ্য ১৮০ সেমি., উচ্চতা ১১০–১২০ সেমি. ও ওজন ১৩০–২৮০ কেজি। গায়ের লোম উলের মতো। শীতে দেহের রং বাদামি থেকে হলদে ও গ্রীষ্মে লালচে-ধূসর হয়। দেহের নিচ ও পায়ের ভিতরের দিক ফ্যাকাশে। লেজের তলা সাদা। বাচ্চার দেহে সাদা ফোঁটা থাকে। পুরুষের ঘাড়ে কেশরের মতো লম্বা লোম আছে। পুরুষের শিং ৭৬ সেমি. ও তাতে ১০–১৪টি চূড়া থাকে। শিঙের গড় দৈর্ঘ্য ৭৫ সেমি. ঘের ১৩ সেমি.।

কৃষ্ণসার: কালসার বা কৃষ্ণমৃগ (Indian Antelope) নামেও পরিচিত। গোত্র Bovidae (বোভিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Antilope cervicapra (অ্যান্টিলোপ সার্ভিক্যাপরা)। একসময় রংপুরসহ পুরো উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর সংখ্যায় ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এদেশে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণমৃগের দেহের দৈর্ঘ্য ১০০–১৫০ সেমি., লেজ ১০–১৭ সেমি., শিং ৫০–৬৫ সেমি. ও উচ্চতা ৬০–৮৫ সেমি.। ওজন ২৫–৩৫ কেজি। দেহ সরু ও লেজ খাটো। পুরুষ কৃষ্ণসারের মতো এত

কৃষ্ণসার

সুন্দর অ্যান্টিলোপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। রঙের সমন্বয় থেকে শুরু করে শিঙের আকার ও দৈর্ঘ্যের সামঞ্জস্য সব দিক থেকেই কৃষ্ণসার অনন্য। শিং খাড়া ও স্ক্রুর ন্যায় প্যাঁচানো। স্ত্রীর শিং নেই। পুরুষ ও স্ত্রীর মাথা ও পিঠের রঙে পার্থক্য রয়েছে। স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক বাচ্চাগুলোর পিঠ, দেহের উপরটা ও দুপাশ হালকা হলদে-বাদামি। বয়স্ক পুরুষগুলোর পিঠ, দেহের দুপাশ ও ঘাড়ের সামনের অংশ কালচে-বাদামি, বয়সের সঙ্গে যা পুরোপুরি কালো হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পেট, চোখের চারদিক ও পায়ের ভিতরটা সাদা। লেজ এবং সামনের ও পেছনের পা কালো।

নীলগাই: এশীয় অ্যান্টিলোপগুলোর মধ্যে নীলগাই বৃহত্তম। গোত্র বোভিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Bocephalus tragocamelus (বুসেফালাস ট্র্যাগুক্যামেলাস)। একসময় পুরো উত্তরবঙ্গের ঝোঁপজঙ্গলপূর্ণ মাঠ, গাছে ঢাকা উঁচুনীচু সমতল বা তৃণভূমিজুড়ে বিচরণ করত। ১৯৪০ সালে সর্বশেষ তেঁতুলিয়ায় দেখা গেছে। বর্তমানে এদেশে বিলুপ্ত।

নীলগাইয়ের দৈর্ঘ্য ১৭০–২১০ সেমি., লেজ ৪৫–৫০ সেমি., শিং ১৫–২৪ সেমি. ও উচ্চতা ১১০–১৫০ সেমি.। ওজন ১০০–২৮৮ কেজি। বৃহত্তম এই এশীয় অ্যান্টিলোপের চেহারা বিদঘুটে, অনেকটা ঘোড়ার মতো। সামনের পা লম্বা; গলায় একগোছা চুল।

নীলগাই

ষাঁড়গুলো ধূসর, নীলচে-ধূসর বা কালচে ও খুরের উপরের লোম সাদা। গাভী ও বাছুর লালচে-বাদামি। দেহের বিভিন্ন স্থানে সাদা দাগ-ছোপ রয়েছে। শুধু পুরুষগুলোরই দেখা যায়। শিং দুটো মসৃণ, ছোটো, কোণাকার ও সামনের দিকে সামান্য বাঁকানো। শিঙের গোড়া ত্রিকোণা ও ডগা বৃত্তাকার।

বান্টেং: গৌর নামেও পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে পোষা বান্টেং রয়েছে যারা বালি বা সাপিবালি গরু নামেও পরিচিত। গোত্র বোভিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Bos javanicus (বস জাভানিকাস)। Bos banteng (বস বান্টেং) বা Bos sundaicus (বস সুন্ডেইকাস) নামেও পরিচিত। চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র পাতাঝরা বনে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাংস ও চামড়ার লোভে স্থানীয় লোকদের শিকারের চাপে এদেশ থেকে বান্টেং চিরতরে হারিয়ে গেছে। অবশ্য স্থানীয় ম্রো আদিবাসীরা বান্দরবানের সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্টে এখনো বান্টেং বেঁচে আছে বলে দাবি করলেও কোনো প্রমাণ মেলেনি।

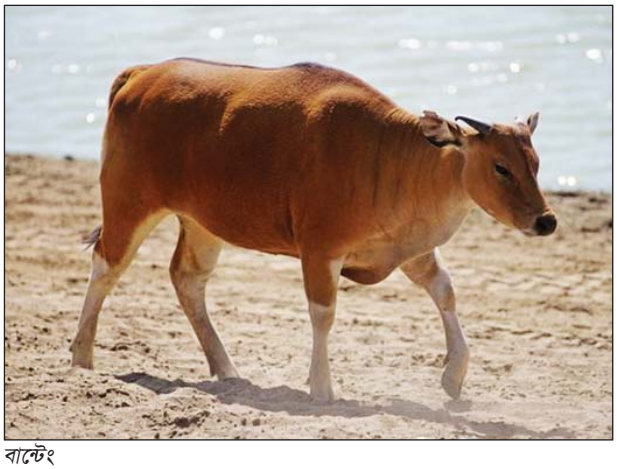

বান্টেং

বান্টেং গাউর থেকে সামান্য খাটো কিন্তু একই রকম সুঠাম গড়নের বনগরু। দৈর্ঘ্য ১৯০–২২৫ সেমি., লেজ ৬০ সেমি., শিং ৬০–৭৫ সেমি. ও উচ্চতা ১৫৫–১৬৫ সেমি.। ওজন ৬০০–৮০০ কেজি। মাথা গাউরের থেকে ছোট ও পা লম্বা। গাভি, বাচ্চা ও অল্পবয়স্ক ষাঁড়ের গায়ের রং লালচে-বাদামি। বয়স্ক ষাঁড় নীলচে-কালো, খয়েরি বা কালচে। ষাঁড় ও গাভীর পায়ে সাদা মোজা; নিতম্ব ও মুখবন্ধনী সাদা।

বুনো মোষ: বনমহিষ, বয়ার, ভারতীয় মহিষ, এশীয় মহিষ বা জলার মহিষ (Indian, Asiatic, Asian or Water Buffalo)

বুনো মোষ

নামেও পরিচিত। গোত্র বোভিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Bubalus arnee (বিউবেলাস আরনি)। একসময় এদেশের প্রায় সব পাহাড়ের পাদদেশ বা নিচু ও জলাশয়িক এবং তৃণভূমিতে দেখা যেত। সুন্দরবন, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ও বাগেরহাটের জঙ্গলে অসংখ্য বুনো মোষ ছিল বলে জানা যায়। সর্বশেষ ১৯৮০–১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জামালপুর থেকে ময়মনসিংহ হয়ে সিলেটের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত এরা বিচরণ করত। অবাধ শিকার এবং মানুষের আবাসন ও কৃষিকাজের জন্য ভূমি উদ্ধারের অত্যধিক চাপে এরা ধীরে ধীরে ভারতের গারো পাহাড়ের দিকে সরে গেছে।

পোষা ও বুনো মোষের পার্থক্য সামান্যই। বুনোগুলোর চামড়া নরম, মসৃণ ও চকচকে। এরা পোষাগুলোর থেকে বেশি সুঠাম, শক্ত-সমর্থ ও তেজী। প্রাপ্তবয়স্ক বনমহিষের দৈর্ঘ্য ২.৪-৩.০ মিটার ও উচ্চতা ১.৫-১.৯ মিটার। পুরুষের শিং মোটা ও স্ত্রীরগুলো লম্বা। ওজন ৯০০ কেজি বা তারও বেশি। দেহের রং গাঢ় শ্লেট-কালো; এতে কিছু কালো লোম থাকে। হাঁটু ও গোড়ালির মাঝখানের অংশ ময়লাটে সাদা। নবজাতক বাছুরের দেহের রং প্রায় হলদে।

বামন শূকর: ঠান্ডারি শুয়োর নামেও পরিচিত। গোত্র Porcidae (পোরসিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Sus salvinus (সাস স্যালভিনাস)। মূলত শালবন ও উলু ঘাসবনে বাস করত। এদেশে কেবল সিলেটেই দেখা যেত। ১৯৬৮ সালের পর এদেশে আর দেখা মেলেনি।

বামন শূকরের আকার একটি বড়োসড়ো খরগোসের মতো। মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য ৪৬–৫০ সেমি. ও উচ্চতা ২০–২৫ সেমি.। ওজন ৩–৫ কেজি। দেখতে সাধারণ বুনো শূয়োরের একমাস

বামন শূকর

বয়েসি বাচ্চার মতো, তবে গায়ে কোনো দাগ নেই, বরং গাঢ় রঙের ও দাগবিহীন। চোয়াল খাটো ও চোখ ছোটো। লেজ খুব ছোটো, সোজা ও অনাবৃত। পেছনের পায়ের ভেতরের আঙুল ছোটো। কান, ঘাড়, পায়ের ভেতরের অংশ ও পেটে লোম নেই বললেই চলে। অন্যান্য অংশের লোমগুলো ঘন শক্ত চুলের মতো। দেহের রং কালচে-বাদামি।

দেশি গণ্ডার: এক শিঙা গণ্ডার, গণ্ডার বা গারা (Indian One-horned Rhinocerous or Indian Rinocerous) নামেও ডাকা হয়। গোত্র Rhinocerotidae (রাইনোসেরোটিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Rhinoceros unicornis (রাইনোসেরস ইউনিকরনিস)। হাতির পর দেশি গণ্ডারই আকারে সবচেয়ে বড়ো স্তন্যপায়ী প্রাণী। একসময় রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা, সিলেট ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। জলাবদ্ধ নিম্নভূমি ও নলতল, উঁচু ঘাস বা ঝোঁপযুক্ত সাভানা বন, শুষ্ক ও মিশ্র বন ইত্যাদিতে বাস করত। ১৯০৮ সালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দেশি গণ্ডার

দেশি গণ্ডারের দৈর্ঘ্য ৩১০–৩৮০ সেমি., লেজ ৩৫–৭০ সেমি. ও উচ্চতা ১৪৭–১৯৩ সেমি.। শিং ২০–৬১ সেমি লম্বা। ওজন ১,৮০০–২,২০০ কেজি। দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চামড়া মোটা, রুক্ষ ও প্রায় লোমশূন্য। চামড়া ধূসর-বাদামি ও অনেকগুলো ভাজযুক্ত; দেখতে বর্মের মতো। সামনের পা ও কাঁধে আঁচিলের মতো গুটি থাকে। নাকের উপর ২৫ সেমি. লম্বা একমাত্র কালো শিং। এর চামড়া কাঁধের সামনে-পেছনে ও উরুর সামনে ভাঁজ হয়ে ঝুলে কয়েকটি বর্মের সৃষ্টি করেছে যা দেখতে অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো।

ছোটো একশিঙ্গী গণ্ডার: জাভাদেশীয় গণ্ডার, গ্যান্ডার বা গ্যাড়া (Javan Rhinoceros) নামেও পরিচিত। গোত্র রাইনোসেরোটিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Rhinoceros sondaicus রাইনোসেরস সনডাইকাস। একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ও সুন্দরবনে বাস করত। ঘাসবনের চেয়ে বরং এরা বনজঙ্গলই বেশি পছন্দ করত। সুন্দরবনের গণ্ডার বলতে এদেরকেই বোঝান হতো। এরা চট্টগ্রাম থেকে ১৮৬৪ ও সুন্দরবন থেকে ১৮৭০–১৮৮৭ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বড় একশিঙ্গী গণ্ডারের চেয়ে ছোটো হলেও এরা একই রকম হৃষ্টপুষ্ট ছিল। বয়স্ক পুরুষ গণ্ডারের কাঁধের উচ্চতা ১.৫–১.৭ মিটার, শিং ছোটো ১৭ সে.মি.। ওজন ৯০০–১,৪০০ কেজি। চামড়ার ভাঁজ বড়ো একশিঙ্গী গণ্ডারের মতোই তবে কাঁধের সামনের ভাঁজ ঘাড়ের পেছনে উপরে উঠে গিয়ে জিন-এর মতো একটি আলাদা বর্ম তৈরি

ছোটো একশিঙ্গী গণ্ডার

করেছে। গুটিগুলো সারা গায়ে পাঁচকোনা বা ছয়কোনা মোজাইকের মতো বিন্যস্ত। স্ত্রী গণ্ডারের শিং নেই, গজালেও তা দেখতে ছোটো ঢিবির মতো। পুরুষের সব সময়ই একটি শিং থাকে।

সুমাত্রার গণ্ডার: এশীয় দুই শিংওয়ালা গণ্ডার বা ছোটো দুই শিংওয়ালা গণ্ডার (Asian Two-horned Rhinocerous, Lesser Two-horned Rhinocerous or Hairy Rhinocerous) নামেও পরিচিত। গোত্র রাইনোসেরোটিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Dicerorhinus sumatrensis (ডাইসেররহিনাস সুমাত্রেনসিস)। বৃষ্টিপাতবহুল বন, জলাভূমি ও মেঘাবৃত বনে বাস করত। সম্ভবত ১৮৮০ দশক পর্যন্ত কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেটে বিস্তৃত ছিল। রেকর্ড অনুযায়ী, ১৮৬৮ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রাম থেকে সর্বশেষ গণ্ডারটিকে ধরা হয় যা পরবর্তীতে লন্ডন চিড়িয়াখানায় নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে বিলুপ্ত। বিশ্বে মহাবিপন্ন ও ২০০টির কম বেঁচে আছে।

গণ্ডারের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এরা সবচেয়ে ছোটো। দৈর্ঘ্য

দুই শিংওয়ালা সুমাত্রার গণ্ডার

২৩৬–৩১৮ সেমি., লেজ ৩৫–৭০ সেমি. ও উচ্চতা ১১০–১৪৫ সেমি.। ওজন ৫০০–৮০০ কেজি। দেহের বেশিরভাগ অংশই লালচে-বাদামি লম্বা ও রুক্ষ লোমে আবৃত। পা চারটি স্তম্ভের মতো। উপরের ঠোঁট বড়শির মতো ও নড়নক্ষম। এশীয় গণ্ডারগুলোর মধ্যে একমাত্র এদেরই শুধু দুটি শিং আছে; নাকের উপরের শিং দুটির মধ্যে সামনেরটি ১৫–২৫ সেমি. ও পেছনেরটি ১০ সেমি.-এর কম। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। কর্তন দাঁত অন্য প্রজাতির মতো দুজোড়া নয় বরং একজোড়া। বাচ্চা ঘন লোমের আবরণে আবৃত, তরুন গণ্ডারের লোম লালচে-বাদামি এবং পরিণত প্রাণীতে কালো রঙের শক্ত চুল বা ব্রিসলে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী

আলোচ্য প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় (Near Extinct) স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী বলতে শুধুমাত্র মহাবিপন্ন বা অতি বিপন্ন (Critically Endangered) বন্যপ্রাণীগুলোকেই বোঝানো হয়েছে।

কাঁকড়াভুক বানর: লম্বালেজি বানর বা প্যারাইল্লা বান্দর (Long-tailed Macaque or Cynomolgus Monkey) নামেও পরিচিত। গোত্র Cercopithecidae (সারকোপিথেসিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Macaca fascicularis (ম্যাকাকা ফ্যাসিকুলারিস)। এই বিরল ও মহাবিপন্ন বানর প্রজাতিটিকে কক্সবাজার জেলার টেকনাফের নাফ

কাঁকড়াভুক বানর

নদীর মোহনার গরান বন ও আশপাশের বনাঞ্চল এবং চট্টগ্রাম জেলার ফাসিয়াখালি বন্যপ্রাণী অভয়াণ্যের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা গেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা ২০টির কম বলে জানা যায়।

মাঝারি আকারের লম্বালেজি এই বানরের পা খাটো। দেহের দৈর্ঘ্য ৩৫–৬৫ সেমি. ও লেজ ৪০–৬৬ সেমি.। ওজন ২.৫–৮.৩ কেজি। দেহের উপরের লোম জলপাই-বাদামি ও ধূসর, নিচটা ধূসর। মুখমণ্ডল গোলাপি-বাদামি, লেজ কালচে। মাথায় ছোটো চূড়া দেখা যায়। নবজাতকের দেহ কালো যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা হতে থাকে। মূলত কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী খায়। তবে ফল-মূল, পাতা, কুঁড়ি, শস্যদানা, কীটপতঙ্গ, মাছ, পাখির বাচ্চা ইত্যাদিও খেতে পারে।

চশমাপরা হনুমান: কালো হনুমান (Phayre's Leaf Monkey or Spectacle Langur) নামেও পরিচিত। গোত্র Colobidae

চশমাপরা হনুমান

(কলোবিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Trachypithecus phayrei (ট্র্যাচিপিথেকাস ফাইরিয়াই)। এই বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণীটির সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। আবাস এলাকা ধ্বংসের কারণে গত তিন প্রজন্মে এদের সংখ্যা প্রায় ৮০% কমে গেছে। বর্তমানে কেবল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা যায়।

চশমাপড়া হনুমানের দৈর্ঘ্য ৫৫–৬৫ সেমি. ও লেজ ৬৫–৮০ সেমি.। ওজন ৫–৯ কেজি। চোখের সাদা চশমা ছাড়া দেহের বাকি অংশের চামড়া কালো। ঠোঁটে সাদা ছোপ। মুখমণ্ডল, কান, হাত ও পায়ের পাতা কুচকুচে কালো। পিঠ, দেহের পাশ ও লেজ কালচে-ধূসর; নিচটা সাদাটে-ধূসর। নবজাতক পুরোপুরি সোনালি; তবে জন্মের এক মাস পরেই ধূসর হয়ে যায়।

শান্তিপ্রিয় প্রাণীটি দিবাচর ও বৃক্ষবাসী। একজন দলনেতার অধীনে ৫–১৫টি একসঙ্গে বসবাস করে। ফলখেকো হলেও গাছের পাতা, বোঁটা, কুঁড়ি, ফুল, বাঁশের অঙ্কুর ইত্যাদিও খায়। গভীর অরণ্য এবং পাহাড় ও ঝরনার আশপাশের বাঁশবনে বাস করে।

উল্লুক: বনমানুষ, হুলু, হুরু, কালা বান্দর বা হুতু বান্দর (Western Hoolock Gibbon or White-browed Gibbon) নামেও

উল্লুক

পরিচিত। গোত্র Hyalobatidae (হায়ালোবেটিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Hoolock hoolock (হুল্লুক হুল্লুক)। শান্তিপ্রিয় এই প্রাণীটির আবাস এলাকা ধ্বংসের কারণে গত দুদশকে এই বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণীটির সংখ্যা প্রায় ৯০% কমে গেছে। বর্তমানে কেবল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা যায়।

উল্লুকের দৈর্ঘ্য ৪০–৬৩ সেমি. ও ওজন ৬–৮ কেজি। এরা এদেশের একমাত্র লেজহীন বানর। ভ্রু ছাড়া পুরুষের পুরো দেহের লোম কালো। স্ত্রী হলদে-ধূসর; ভুরু সাদা, চোখের চারদিকে সাদা রিং। হাত, পা ও আঙুল কালো। বাচ্চা ধূসর-সাদা; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হলদে-ধূসর বর্ণ ধারণ করে।

চীনা বনরুই: চীনা পিপীলিকাভুক বা চীনা পিঁপড়াভুক নামেও পরিচিত। গোত্র Manidae (ম্যানিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Manis pentadactyla (ম্যানিস প্যান্টাড্যাকটাইলা)। আবাস এলাকা ধ্বংস ও মাংসের জন্য শিকারের কারণে এই বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণীটির সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে কেবল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা যায়।

চীনা বনরুইয়ের দেহের দৈর্ঘ্য ৪২–৯২ সেমি. ও লেজ ২৮–৩৫ সেমি.। ওজন ২–৭ কেজি। সদ্য জন্মানো বাচ্চা ৪৫ সেমি. ও ওজন প্রায় ৪৫০ গ্রাম। দেহ গোলাকার, মাথা ছোটো ও সুচালো। দেহে ১৮ সারি আঁশ রয়েছে; আঁশের ফাঁকে ফাঁকে লোম। দেহের

চীনা বনরুই

রং পীতাভ ও আঁশের রং হলদে-বাদামি। অত্যন্ত নড়নক্ষম জিহ্বাটি ২৫ সেমি.।

চিতা বাঘঃ ফুলেশ্বরী, নাগেশ্বরী বাঘ, চিত্রা, টিক্কাপরা বা গোলবাঘ (Panther) নামেও পরিচিত। গোত্র Felidae (ফ্যালিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Panthera pardus (প্যানথেরা পারডাস)। ১৯৪০ সালের আগ পর্যন্ত সুন্দরবনের বেশিরভাগ এলাকা ও উপকূলীয় বনাঞ্চল ছাড়া পুরো বাংলাদেশে দেখা মিলত। বর্তমানে বিরল ও মহাবিপন্ন এই প্রাণীটি সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের চিরসবুজ বনে কৃচিৎ দেখা যায়।

চিতা বাঘ

চিতাবাঘ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিড়ালজাতীয় প্রাণী। দৈর্ঘ্য ৯০–১৬৫ সেমি., লেজ ৬০–১১০ সেমি. ও উচ্চতা ৪৫–৮০ সেমি.। ওজন ২৩–৯১ কেজি। মাথা বড়ো, পা খাটো ও লেজ লম্বা। দেহের উপরটা হলদেটে বা সোনালি ও নিচটা সাদাটে। পুরো দেহে কালো গোলাপের মতো কারুকাজ, মুখমণ্ডল ও পায়ে এসে যা কালো ফোঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে। কদাচ কালো চিতার দেখা মিলে। এরা নিশাচর ও নিঃসঙ্গ। বুদ্ধিমান শিকারি ও গাছে চড়তে ওস্তাদ। নিজ দেহের ওজনের চেয়ে বড়ো প্রাণী শিকার করে সহজেই গাছের উপর টেনে তুলে নেয়। হরিণ, শূকর, বানর, সজারু, খরগোশ, পাখি, গবাদিপশু, এমনকি মানুষের বাচ্চা খায়।

মেঘা বাঘঃ গেছো বাঘ, গেছো চিতা, লাম চিতা বা লতা বাঘ নামেও পরিচিত। গোত্র ফ্যালিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Neofelis nebulosa (নিউফেলিস ন্যাবুলোসা)। শিকার ও উপজাতীয়দের দ্বারা অযাচিত হত্যা এবং আবাস এলাকা ধ্বংসের কারণে এই বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণীটি একেবারেই কমে গেছে। বর্তমানে

মেঘা বাঘ

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের চিরসবুজ বন ছাড়া আর কোথাও দেখা মেলে না। তবে অনেক সময় ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ে দেখা যায়।

মেঘা বাঘের দৈর্ঘ্য ৭৫–১০৫ সেমি., লেজ ৭০–৯০ সেমি. ও উচ্চতা ৫০–৬০ সেমি.। ওজন ১৮–২২ কেজি। মাথা বড়ো, পা ছোটো ও লেজ লম্বা। দেহের উপরটা মেটে-বাদামি থেকে হলদে-বাদামি; তাতে কতকগুলো কালো বর্ডারযুক্ত ধূসর উপবৃত্তাকার দাগ রয়েছে। দেহের নিচটা বাদামি থেকে সাদাটে। মাথা ও পায়ে কালো ফোঁটা ও লেজে কালো বলয়।

বাঘঃ ব্যাঘ্র বা বাঘ মামা (Bengal Tiger, Royal Bengal Tiger or Indian Tiger) নামেও পরিচিত। গোত্র ফ্যালিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Panthera tigris tigris (প্যানথেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস)। একসময় পুরো দেশজুড়ে বিস্তৃত থাকলেও নানা কারণে এই অতি বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণীটি বর্তমানে কেবল সুন্দরবনেই সীমাবদ্ধ। তবে সম্প্রতি বান্দরবানেও এদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে সর্বমোট ১০৫টি বাঘ রয়েছে বলে জানা যায়।

বাঘ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বিড়ালজাতীয় প্রাণী। দৈর্ঘ্য ১৪০–২৮০ সেমি., লেজ ৬০–১১০ সেমি. ও উচ্চতা ৯৫–১১০ সেমি.। ওজন ১৮০–২৮০ কেজি। বাংলাদেশের জাতীয় পশুর দেহের লোম সোনালি বা কমলা ও তাতে চওড়া কালো ডোরা থাকে। দেহতলের মূল রং সাদা। লম্বা লেজটিতে থাকে কালো ডোরা। পুরুষের মাথার দুপাশে লম্বা লোম।

এরা নিঃসঙ্গ শিকারি; দিনে বা রাতে শিকার করে। দক্ষ সাঁতারু।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

মল-মূত্রের মাধ্যমে নিজের বিচরণ এলাকা চিহ্নিত করে। চিত্রা হরিণ, বুনো শুয়োর, বানর, সজারু, বড়ো পাখি, মাছ, কদাচ গরু-ছাগল ও মানুষ খায়। গরান বন, চিরসবুজ ও কনিফার বন, শুষ্ক কণ্টকময় বন, উঁচু ঘাসবন ইত্যাদিতে বাস করে।

মসৃণ উদ: উদ্বিড়াল, ভোঁদড়, মাছ নেউল বা ধেড়ে (Smooth Indian Otter or Indian Smooth-coated Otter) নামেও পরিচিত। গোত্র Mustelidae (মাস্টেলিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম Lutrogale perspicillata (লুট্রোগেল পারস্পিসিলাটা)। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পুরো দেশজুড়ে বিস্তৃত থাকলেও শিকার, আবাস এলাকা ধ্বংস ও বাণিজ্যিক মৎস্য খামার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কারণে এদের সংখ্যা ৯০% কমে গেছে। বর্তমানে এই বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণীটি শুধু দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশি দৃশ্যমান।

মসৃণ উদ

এরা এশিয়ার বৃহত্তম উদ। দেহের দৈর্ঘ্য ৫৯–৭৯ সেমি. ও লেজ ৩৭–৫০ সেমি.। ওজন ৭–১১ কেজি। লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ, খাটো পা ও ধারালো নখযুক্ত পুরো পাতাওয়ালা আঙুল। দেহ ও মাথার মতোই চওড়া ঘাড়। অন্যান্য উদের তুলনায় লোম খাটো ও মসৃণ এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। দেহের উপরটা হালকা থেকে গাঢ় বাদামি ও নিচটা হালকা বাদামি থেকে প্রায় ধূসর।

সুর ভালুক: সূর্য ভল্লুক বা মালয়দেশীয় ভালুক (Malayan Sun Bear or Honey Bear) নামেও পরিচিত। গোত্র উরসিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Helarctos malayanus (হেলারকটস মালায়ানাস)। বিরল ও মহাবিপন্ন ভালুক প্রজাতিটি চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বন, বাঁশবন ও লম্বা ঘাসের বনে বাস করে।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো প্রজাতির ভালুক। দৈর্ঘ্য ১১০–১৪০ সেমি., লেজ ৫ সেমি. ও উচ্চতা ৭০ সেমি.। ওজন ৩৫–৮০ কেজি। দেহের তুলনায় পা বড়ো। গায়ের লোম ছোটো, মসৃণ ও কুচকুচে কালো। মুখমণ্ডল ময়লা-সাদাটে। কান ছোটো ও গোলাকার। বুকে বা অর্ধচন্দ্রাকৃতির সাদাটে, হলদে বা সোনালি চিহ্ন থাকে। আকারে পুরুষ বড়ো।

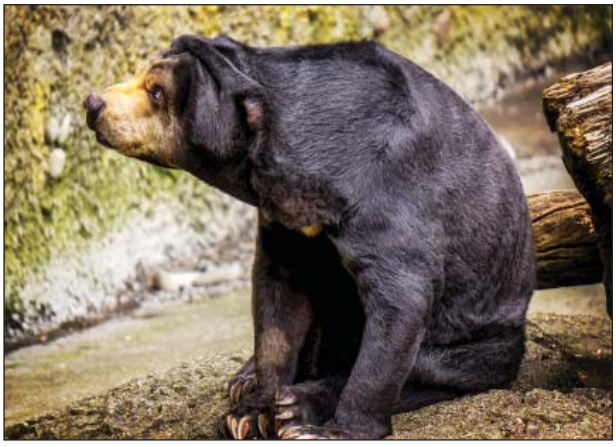

সুর ভালুক

এরা নিশাচর ও একাকী থাকে। ক্ষিপ্রগতিতে গাছে চড়তে সক্ষম। ফল, লতাপাতা, পাখি, উইপোকা, কেঁচো, অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও মধু খায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাহাড়ি বনভূমিতে বাস করে।

কালো ভালুক: ভালুক, ভল্লুক বা বড়ো ভাল্লুক (Asiatic Black Bear, Himalayan Black Bear, Tibetan Black Bear or Moon Bear) নামেও পরিচিত। গোত্র উরসিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Ursus thibetanus (উরসাস থিবেটেনাস)। বিরল ও মহাবিপন্ন ভালুক প্রজাতিটি চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বন, বাঁশবন ও লম্বা ঘাসের বনে বাস করে।

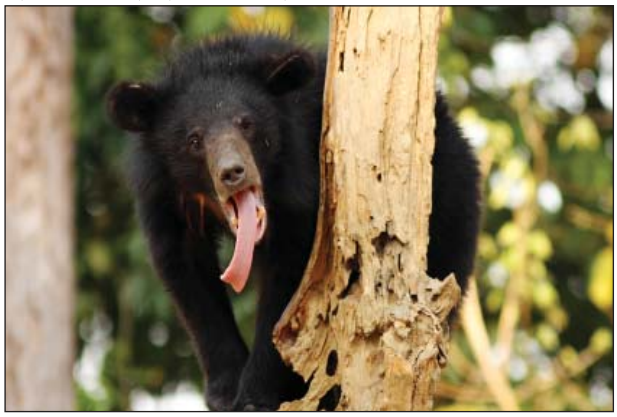

কালো ভালুক

ভালুকের দেহের দৈর্ঘ্য ১২০–২২০ সেমি., লেজ ৭–১০ সেমি ও উচ্চতা ৭৫ সেমি। ওজন ৯০–১৮০ কেজি। দেহের লোম মসৃণ ও কুচকুচে কালো। মুখমণ্ডল হলদে-ধূসর। নাক সুচালো ও কান বড়োসড়ো। নিচের ঠোঁট সাদা। বুকে ঘোড়ার খুরাকৃতির মতো সাদা চিহ্ন। পুরুষ আকারে বড়ো।

এরা দিবাচর ও নিশাচর। একাকী, জোড়ায় বা ছোটো পারিবারিক দলে থাকে। গাছে চড়তে ও সাঁতার কাটতে সক্ষম। সর্বভুক; ফল, কীটপতঙ্গ (প্রধানত উইপোকা), মধু, মরা-পচা প্রাণী, শস্য ইত্যাদি খায়। বাঁশবন, লম্বা ঘাসের বন, জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড় ইত্যাদিতে বাস করে।

গাউর: বনগরু (Indian Bison) নামেও পরিচিত। গোত্র বোভিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Bos garus (বস গরাস)। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ও গহিন অরণ্যে আছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে

গাউর

জানা যায়। এটি বিরল ও মহাবিপন্ন। যদিও বিলুপ্ত বলে অনেকে ধারণা করেছিল, কিন্তু অতি সম্প্রতি বান্দরবানের সাঙ্গু-মাতামুহুরি রিজার্ভ ফরেস্টে এদের দেখা গেছে।

বোভিডি পরিবারের বৃহত্তম সদস্য বনগরুর দৈর্ঘ্য ২৫০–৩৬০ সেমি., লেজ ৭০–১০০ সেমি. ও উচ্চতা ১৭০–২২০ সেমি.। ওজন ৯০০–১,৩০০ কেজি। দেহের রং কালচে বা কালচে-বাদামি। বাছুর ও অল্পবয়স্কগুলোর রং বাদামি। খুর কালচে। খুরের উপর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লোম সাদা। অর্ধচন্দ্রাকৃতির শিং দুটি বেশ সুন্দর ও ৩২–৮০ সেমি. লম্বা।

সাম্বার: মইশা হরিণ, কালেশ্বর বা ধলেশ্বর (Sambar Deer or Rusa Deer) নামেও পরিচিত। গোত্র সারভিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Cervus unicolour (সারভাস ইউনিকালার)। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দুর্গম ও গহিন মিশ্র চিরসবুজ বনে ২৫০টিরও কম সংখ্যক বেঁচে আছে। এই বিরল ও মহাবিপন্ন হরিণটির আবাসস্থলের ৮০%ই বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু।

সাম্বার হরিণ

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড়ো হরিণ সাম্বারের দৈর্ঘ্য ১৮০–২২০ সেমি., লেজ ৩০ সেমি. ও উচ্চতা ১০০–১৬০ সেমি। ওজন ২২৫–৩৫০ কেজি। লোম রুক্ষ। হরিণের কেশরের মতো লম্বা লোম আছে। দেহের রং গাঢ় ধূসরে-বাদামি। হরিণী ও বাচ্চাগুলোর রং হরিণের চেয়ে বেশি লালচে। দেহে কোনো ফোঁটা নেই। কোনো কোনো হরিণের রং বেশি কালচে। হরিণের শিং ১১০ সেমি. ও তাতে ৩টি চূড়া থাকে।

পারা হরিণ : নাত্রিনি হরিণ, লুভ হরিণ বা শূকর হরিণ (Indian Hog Deer) নামেও পরিচিত। গোত্র সারভিডি। বৈজ্ঞানিক নাম Axis porcinus (অ্যাক্সিস পরসিনাস)। একসময় সুন্দরবনসহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা যেত। পরবর্তীতে বিলুপ্ত বলে ধারণা করা হয়েছে; কিন্তু ২০০২ সালে খাগড়াছড়ির গুইমারা ও তবলছড়িতে পুনরাবিষ্কার করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির ন্যাড়া মিশ্র চিরসবুজ বনে অল্প ক'টি বেঁচে আছে বলে জানা যায়।

বিরল ও মহাবিপন্ন পারা হরিণের দৈর্ঘ্য ১১০ সেমি., লেজ ২০ সেমি. ও উচ্চতা ৬৫ সেমি.। ওজন ৩০–৫০ কেজি। দেহ মজবুত ও বলিষ্ঠ এবং পা খাটো। দেহের রং ময়লা বাদামি, তাতে ধূসর বা সাদা ফোঁটা থাকতে পারে। দেহের নিচটা ফ্যাকাশে। হরিণের দেহের রং হরিণীর থেকে গাঢ়। পুরুষের মাথায় ৩০ সেমি. লম্বা তিন চূড়াবিশিষ্ট শিং থাকে যা প্রতিবছর ঝরে পড়ে।

পারা হরিণ

হাতি: হস্তি বা ঐরাবত (Indian Elephant) নামেও পরিচিত। গোত্র এলিফ্যানটিডি (Elephantidae)। বৈজ্ঞানিক নাম Elephas maximus (এলিফাস ম্যাক্সিমাস)। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ও ভারী স্থলের স্তন্যপায়ী প্রাণী হাতি বর্তমানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলার মিশ্র চিরসবুজ বন এবং শেরপুরের মিশ্র পাতাঝরা বনে বাস করে। বাংলাদেশে এটি বিরল ও মহাবিপন্ন, বিশ্বে বিপন্ন। বুনো পরিবেশে মাত্র ২০০–২২৫টি বেঁচে আছে।

হাতির দৈর্ঘ্য ৫.৫–৬.৫ মি., লেজ ১.২–১.৫ ও উচ্চতা ২.৪–২.৭ মিটার। ওজন প্রায় তিন টন। সদ্য জন্মানো বাচ্চা ০.৯ মিটার উঁচু ও ওজন প্রায় ৯০ কেজি। স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ আকারে বড়ো। দেহের

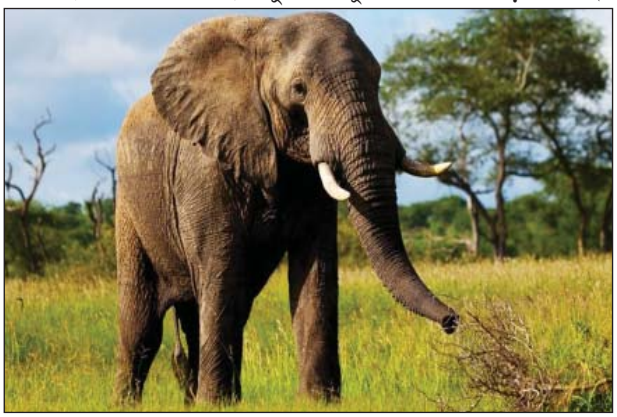

হাতি

রং ধূসর ও পুরো দেহ ঘন ঢিলেঢালা বিক্ষিপ্ত চুলে আবৃত। শুঁড় লম্বা, কান প্রশস্ত ও ত্রিকোনাকার। মাথা বেশ বড়ো, ঘাড় খাটো ও দেহ স্থূল। চোখ ছোটো হলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। গজদন্ত লম্বায় ১.৮ মিটার ও ওজন ৭২–৭৩ কেজি। স্তম্ভের মতো পাগুলো সোজা।

আমাদের হারিয়ে যাওয়া স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীগুলো একসময় এদেশের প্রকৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিরাজ করত। কিন্তু মানুষের লাগামহীন লোভের কারণে আজ তারা হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাওয়া প্রাণীগুলোকে হয়তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু এখনও যেগুলো বেঁচে আছে ও বিলুপ্তির দোড় গোড়ায় এসে ঠেকেছে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং সংখ্যা বাড়াতে হবে। এ ব্যাপরে আমাদের সকলকে এখনই সচেতন হতে হবে। আমরা চাই না বাংলাদেশ থেকে আর কোনো বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হোক।

লেখক ও আলোকচিত্রী: বন্যপ্রাণী জীববিজ্ঞানী ও প্রাণীচিকিৎসা বিশেষজ্ঞ।

প্রবন্ধ

শ্রম পরিস্থিতি

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

শোহরাব আহম্মেদ

পৃথিবীর আদি থেকে শ্রমই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে এসেছে। মেধা আর শ্রমের সমন্বয়ে বিকশিত হয়েছে সমাজ ও সভ্যতা। শ্রম পণ্য হয়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ তার শ্রমকে ব্যবহার করেছে প্রকৃতির খামখেয়ালির বিরুদ্ধে আর খাদ্যসহ বেঁচে থাকার অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করার কাজে। সে কারণে আমরা বলতে পারি, আদিম সমাজে শ্রম ব্যবহৃত হয়েছে বেঁচে থাকার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে।

আদিমকালে সম্মিলিতভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পড়েনি একে অন্যের শ্রমকে লুটে নেওয়ার। শ্রম-দাসত্ব শুরু হয়েছিল দাস সমাজের গোড়াপত্তন থেকে। আর এই সমাজ থেকে শুরু হয় মানুষের মানবাধিকার বিপর্যয়। শ্রম-দাসত্বের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কৃষিভিত্তিক মান্ধাতা আমলের সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে শ্রম বিক্রির প্রবণতাটি শুরু হয়েছিল ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক যুগ থেকেই। অর্থাৎ সামন্ত সমাজের গর্ভেই জন্ম নেয় পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তাই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

পুঁজিবাদের বিকাশের প্রারম্ভিক সময় থেকে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে বিপরীতভাবে ১০ থেকে ১৬ ঘণ্টা শ্রম দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকায় কাজের সময় ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। কখনো কখনো আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো একজন শ্রমিককে। ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়াতে যখন ধর্মঘটরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তখন উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা খাটানো হচ্ছিল শ্রমিকদের। ১৮২০ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট হয়। দাবি তোলা হয় ১০ ঘণ্টা শ্রমদিনের। ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে জেনেভায় মার্কস ও এঙ্গেলস-এর ডাকে অনুষ্ঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনেই দাবি তোলা হয় ৮ ঘণ্টা শ্রমদিনের।

এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য সুদৃঢ় হতে থাকে এবং দেশে দেশে শ্রমঘণ্টা নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকদের উপর চলে মালিক শ্রেণির নির্দেশে পুলিশের নির্যাতন। গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। পরে প্রহসনের বিচারে স্পাইস, অস্কার প্রমুখ শ্রমিক নেতাদের মৃত্যু বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে রচনা করে এক আত্মোৎসর্গের মহাকাব্য। ১৮৮৯ সালের ১লা মে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সৃষ্টি হয়। আমেরিকার শিকাগো শহরের ৩ লাখ শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নেয়।

মে দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক সংহতি দিবস। দেশে দেশে এই দিনটি পালিত হয় শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও সংহতিকে সামনে রেখে। পাকিস্তান আমলে ১লা মে'তে কোনো সরকারি ছুটি ছিল না।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর— ৯ মাসের রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয়। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সাল থেকে ১লা মে' কে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। একই বছরের ২২শে জুন বাংলাদেশ আইএলও'র সদস্যপদ লাভ করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে আইএলও'র মৌলিক ৭টি কনভেনশনসহ ৩৩টি কনভেনশনে সমর্থন করেন। ১৯৭৩ সাল থেকে আইএলও ঢাকায় অফিস স্থাপন করে বাংলাদেশে তার কাজ শুরু করে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থে মজুরি ও বেতন কমিশন গঠন করে মজুরি ও পে-স্কেল বাস্তবায়ন করে।

মে দিবসের স্বতঃস্ফূর্ত র‍্যালি

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করেন, যা ২০০৯ সালে ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

ইতোমধ্যে শ্রমিকদের চাকরির বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছর, মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির বয়সও ৫৭ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করা হয়েছে। সেই সাথে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদ ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তার অতীত কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে

যে সকল কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে তারমধ্যে আছে—

- শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের সময়সীমা ৬০ বছরে বৃদ্ধিকরণ
- পরিবর্তিত বিশ্বায়ন জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর স্বার্থে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে Green jobs সৃষ্টি এবং Decent work চালু করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ
- নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করা হয়েছে
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন সংশোধন আইন কর্মসূচি গ্রহণ।

বর্তমান সরকার গার্মেন্ট সেক্টরের উত্তরোত্তর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা কার্যকর করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এরমধ্যে গার্মেন্ট সেক্টরের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া বহাল রাখার তাগিদে সরকারের ১৯ সদস্যের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন করা হয়েছিল। গার্মেন্ট শিল্প আমাদের দেশের একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রাণ। ৪০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী এই সেক্টরে নিয়োজিত। এখানে নিয়মিত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১৩ সালে মাসিক সর্বনিম্ন বেতন ৩০০০ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৫৩০০ টাকায় উন্নীত করেছে।

পোশাক কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিক

দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের ২৬টি জেলায় ৩২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের জন্য ৬টিসহ ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এখানে ১৯টি ট্রেডে ২০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। তাদেরকে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল কেন্দ্র থেকে প্রতিবছর ৪ হাজার ৩২০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রতিবছর ১০ হাজার যুব নারীকে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১০' গঠন করে সর্বনিম্ন ২৪৫০ টাকা থেকে ৪১৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩৫০০ টাকা থেকে ৫৬০০ টাকা মজুরি স্কেল ও ভাতা সুবিধাদি নির্ধারণ করে পণ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক চাকরির শর্তাবলি আইন ২০১২' প্রবর্তন করা হয়েছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে 'সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩' অনুমোদিত হয়েছে। গঠন করা হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। প্রণয়ন করা হয়েছে 'শিশু নীতিমালা ২০১০'। আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সব ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন করাই এই নীতিমালার লক্ষ্য।

বেসরকারি সড়ক পরিবহণ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যক্তি মালিকানাধীন 'সড়ক পরিবহণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন ২০০৫' প্রণীত হলেও এটি বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা না থাকায় শ্রমিকরা তার সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল। আইনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন 'বেসরকারি সড়ক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

নৌযান শ্রমিকরা সর্বশেষ মোট মজুরির ২০% বর্ধিত বেতন পাচ্ছে। নাবিকদের জন্য গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের কাজে যোগদানের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। নাবিকদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে আরো তিনটি মেরিন একাডেমির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২'। গৃহকর্মের সাথে নিয়োজিত গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৪' প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

দেশের সরকারি-বেসরকারি শিল্পকারখানায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির যা কিছু অর্জন তার মূলে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণির গঠনমূলক আন্দোলন। একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শ্রমিকসহ শিল্পমালিক ও তাদের মাধ্যম হিসেবে সরকারের দায়িত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই লক্ষ্যেই সরকারের সঙ্গে সবাইকে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে হবে— এই হোক মে দিবসের অঙ্গীকার।

লেখক: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা

অতীত ও বর্তমান

আতিক আজিজ

স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা আগের তুলনায় আরো ব্যাপক, বিচিত্রমুখী ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। একাডেমিক চর্চার বাইরে রবীন্দ্র জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে তো বটেই, তাছাড়াও পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষাবরণ, পয়লা ফাল্গুনে বসন্তবরণ প্রভৃতি উৎসবের সময় সংগীত, নৃত্য ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সহজ ও আন্তরিক রবীন্দ্র প্রীতি ও চর্চার অবদান নির্ভুলভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। এর ব্যাপ্তি শতাব্দী ছাড়িয়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এখানে রবীন্দ্রচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বহুলাংশে প্রতিকূল। তবু তারমধ্যেও বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা বন্ধ হয়নি। বরং তা একটা নতুন মাত্রিকতা পায়। ১৯৬৭ সালে যখন পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হলো, তখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মওলানা ভাষানী ৬৭-এর জুলাই মাসের শেষ দিকে বলেন, 'ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, যাঁরা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।'

'৬৭-তে ঢাকায় রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। ১৯৬৮-তে পাঁচ মহান কবি–রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, গালিব, মাইকেল ও নজরুলকে নিয়ে আয়োজিত 'মহাকবি স্মরণোৎসব' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে ইসলামিক একাডেমির পরিচালক আবুল হাশিম বলেছিলেন, 'যাঁহারা ইসলাম ও পাকিস্তানি আদর্শের নামে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাঁহারা শুধু মূর্খই নহেন, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত ও তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ না বোঝেন ইসলাম'। '৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে সদ্য কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্সের জনসভায় বলেন, 'আমরা এই ব্যবস্থা (সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রচর্চার বাধা) মানি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এদেশে গীত হইবেই।'

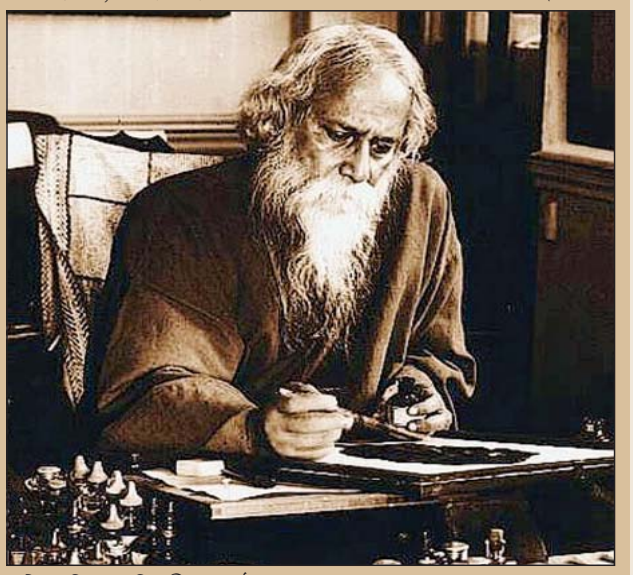

সৃষ্টিতে নিমগ্ন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'৬৯-এর ডিসেম্বরেই আরেকটি অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ভেস্টেড কোয়ার্টার্স উইল অলওয়েজ বি অ্যাকটিভ টু ব্রিঙ কালচারাল সাবজুগেশন টু পারপেচুয়েট এক্সপটেশন অব দ্য পিপল, বাট দ্য পিপল মাস্ট স্ট্যান্ড ইউনাইটেড টু কারেজাসলি ডিফেন্ড দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার আন্ডার অল সারকাম্সটেনসেস'। এর ঠিক দু'বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করল। তাঁর গানের বাণী ও সুর, অন্যায়-অনাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ, তাঁর উদার মানবিকতাবাদ তাদেরকে দুর্দিনে সাহস জুগিয়েছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু এসব ছাড়াও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্তত দুটি অভিনন্দনযোগ্য উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কবি ও প্রাবন্ধিক আহমদ রফিকের উদ্যোগে ঢাকায় রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা, চর্চা ও অনুশীলন এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র'। এই সংস্থা ছাড়াও ঢাকাস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একটি রবীন্দ্র অধ্যয়ন চক্র পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রম স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চার ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী ছাড়া বিরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় না। আমাদের বেশিরভাগ সাধারণ পাঠক-সমালোচকের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম এখনো বিপুল অনুপ্রেরণার উৎস, প্রগতির সহায়ক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমাদের অন্যতম সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত, আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নানা ক্ষেত্রে, নানা বিষয়ে।

রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত অঙ্গন রবীন্দ্র নাটকও স্বাধীন বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ পেয়েছে। তাঁর নাটক, বিশেষ করে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশেও সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নিসর্জন, মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তকরবী, শেষরক্ষা, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটক এবং দুই বোন উপন্যাস ও শাস্তি ছোটগল্পের নাট্যরূপ মঞ্চে এবং শেষের কবিতার টেলিভিশন নাট্যরূপ মিনি-পর্দায় যে নিষ্ঠা ও নতুনত্ব নিয়ে পরিবেশিত হয়েছে তারমধ্যে আমাদের সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চার একটা দিক বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে ২৫শে বৈশাখ ১৪২২ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রথম চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ড. মযহারুল ইসলাম। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছার একটি সফল পরিণতি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা যে আরো ব্যাপক হবে, আরো গভীরতা অর্জন করবে, নতুন নতুন পথে অগ্রসর হবে, এ যাবৎ লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সংগতভাবেই সে আশা পোষণ করতে পারি।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

সর্বকালের নজরুল

জাকির হোসেন চৌধুরী

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রতীক। এই দামাল কবি সারাজীবন অন্যায়, অসুন্দর আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করে গেছেন। তাইতো তিনি বিদ্রোহী কবি বলেও আমাদের স্বগর্ব উচ্চারণ। তাঁর এক হাতে রণতুর্য আর অন্য হাতে বাঁশের বাঁশরী। জীবনের প্রতি পরতে পরতে প্রেম ও বিদ্রোহের জলন্ত সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে–থাকবেও। তাইতো তিনি সর্বকালের নজরুল।

ব্যক্তি জীবনে নজরুলের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও বংশবিজাতে ও পূর্বপুরুষদের কৌলিণ্য লক্ষ করার মতো। সম্রাট শাহ আলমের সময় তাঁর পূর্বপুরুষরা পাটনার হাজীপুর থেকে বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে আসেন। মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত এক বিচারালয়ে তাঁরা কাজীর পদ লাভ করেন এবং প্রচুর জায়গা-সম্পত্তির অধিকারী হন। কাজী নজরুল ইসলাম এই কাজীদেরই বংশধর।

কবি ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফকির আহম্মদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। মাত্র আট বছর বয়সে গ্রামের মক্তবের ছাত্রাবস্থায় কবি পিতৃহীন হন। নজরুল দশ বছর বয়সে ১৩১৬ সালে এই মক্তব থেকেই নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অর্থাভাব এমন নির্মমভাবে দেখা দেয় যে, তাঁকে বাধ্য হয়ে এই খেলার বয়সে উক্ত মক্তবে শিক্ষকতা করতে হয়।

আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন মক্তবের শিক্ষক মৌলভি কাজী ফজলে আহম্মদের কাছে। তাঁর এক পিতৃব্য কাজী ফজলে করীম ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ফারসি ভাষায় কবিতা লেখার চেষ্টা করতেন। এর সাহচর্যে ক্রমে কবি আরবি-ফারসি উর্দু মিশ্রিত বাংলায় কাব্য রচনা শুরু করেন। কবির অনেক বাল্য রচনায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি বাংলা গীতি-ধারার প্রবর্তন করলেন। তাঁর কাব্য ও গীতিতে বিশেষ করে গজল গানে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের যে স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তার বীজও সুপ্তাকারে এখানেই নিহিত।

অতি সাধারণ অবস্থায় লেটো দলে যোগদান করেছিলেন নজরুল। নিজ প্রতিভাবলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দলে শ্রেষ্ঠতম পদটি অধিকার করে নিলেন– হলেন 'ওস্তাদ'। এরপর লেটো দলের প্রতি তাঁর সব আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। তিনি দল ত্যাগ করে মাথরুন হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক। আর্থিক অনটন ও মানসিক অস্থিরতার কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাথরুন স্কুল ত্যাগ করে তিনি কবি গানের দলে যোগ দেন।

এক শীতের রাতে এই সখের কবিগানের আসরে কবির গান শুনে মুগ্ধ হন এক বাঙালি খ্রিষ্টান গার্ড সাহেব। তিনি তাঁকে বাবুর্চির কাজ দিয়ে নিয়ে আসেন প্রসাদপুরের বাংলায়। কিন্তু নানা কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই গার্ড সাহেবের চাকরি ছেড়ে কবি চলে আসেন আসানসোলে। এখানে তিনি এম বখশের চা-রুটি দোকানে একটা চাকরি পেলেন ১৩১৭ সালে। মাসে বেতন এক টাকা, আহার ফ্রি, কিন্তু থাকার জায়গা ছিল না। পাশেই একটি তিনতলা বাড়ির সিঁড়ির নিচে সারাদিনের পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত নজরুল ঘুমিয়ে থাকতেন। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ থাকতেন ঐ বাড়িতে। তার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে এবং পরে তিনি মাসিক পাঁচ টাকায় কবিকে গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। এখানে কবি ছিলেন তিন মাস।

কাজী রফিজউল্লাহ এবং তাঁর স্ত্রী শামসুন্নেসা সত্যিই কবিকে স্নেহ করতেন। তাদের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার কাজীর শিমলা গ্রামে। তাঁদের প্রচেষ্টায় কবি ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাই স্কুলে ১৩২০ সালে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু এই নতুন পরিবেশেও কবির অবস্থান মাত্র কয়েক মাসের। ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেন।

এরপর তিনি ভর্তি হন শিয়ারশোলে রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ এই তিন বছরে স্থিতিশীল জীবনে তিনি অষ্টম শ্রেণি থেকে একনাগাড়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি মাসিক সাত টাকা হিসেবে বৃত্তি পেতেন। আর পেয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। কবির ফারসি ভাষার প্রতি আগ্রহের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই স্কুলের ফারসি শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবীর সাহচর্যে এসে তাঁর সে আগ্রহ অনেকাংশ পূর্ণ হয়েছিল। নজরুলের দ্বিতীয় ভাষা ছিল ফারসি। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন এক পাঞ্জাবি মৌলভির কাছে নজরুল যে কবি হাফিজের কবিতা পাঠ করতে পেরেছিলেন তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুতিতে হাফিজ নুরুন্নবীর অবদান অবশ্যই স্বীকার্য।

১৩৩১ সালের ১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল, ১৯২৪) নজরুল প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মিসেস এম রহমান-এর উদ্যোগে কুমিল্লার ৬নং হাজি লেনে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

গোটা বিশ ও তিরিশের দশকে গান, কবিতা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নজরুল মাতিয়ে রাখলেন সারা বাংলাকে, যার রেশ যুগ যুগ ধরে উজ্জ্বল ও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। চল্লিশের দশকের প্রথমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলি উৎসবে নজরুল তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণে বলেন, 'যদি আর বাঁশি না বাজে আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন, মনে করবেন, পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল অপূর্ণতার বেদনায় তারই আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের কাঁদিয়ে গেল'।

কবির আত্মা বুঝি অনাগত ভয়াল দিনগুলোর প্রতিচ্ছবি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চিকিৎসার ব্যাপারে দেশ-বিদেশে বহু চেষ্টা করেও কবির বাকশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ সরকার প্রধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভারত সরকার লোকপ্রিয় নজরুলকে বাংলাদেশ নিয়ে আসার অনুমতি দেন। অতঃপর কবির ৭৩তম জন্মদিন ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২৪শে মে কবিকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট বহু আনন্দবেদনায় ক্ষতবিক্ষত কবির নির্বাক দেহটি চিরদিনের জন্য নিস্পন্দ হয়ে যায়। (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)। 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই'–কবির ইচ্ছা অনুযায়ী ২৯শে আগস্ট কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

বিশেষ নিবন্ধ

বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা

মো. সালাহউদ্দিন

শরীর ও মানস গঠনে খেলাধুলা অপরিহার্য। গ্রামগঞ্জের শিশু-কিশোর এবং বড়োরা অবসর বিনোদনের অংশ হিসেবে নানারকম দেশীয় খেলাধুলায় মেতে ওঠে। তাই সেগুলো গ্রামীণ খেলা নামে পরিচিত। বর্তমানে ক্রিকেট, ফুটবল, ফেসবুক ও আকাশ সংস্কৃতির বিপুল জনপ্রিয়তা এবং শিশুদের উপর পড়াশুনার অপ্রয়োজনীয় চাপের ফলে এসব খেলা গ্রাম থেকেও হারিয়ে যেতে বসেছে। গ্রামীণ খেলাধুলা আবহমান গ্রামবাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছু গ্রামীণ খেলার নিয়ম তুলে ধরা হলো :

কানামাছি

বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে কানামাছি একটি মজার খেলা। এ দেশের সর্বত্র শিশু-কিশোররা এ খেলা খেলে থাকে। কানামাছি খেলার সময় নিচের ছড়াটি বলতে হয়।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যারে পাবি তারে ছোঁ

এ খেলায় কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়, সে অন্য বন্ধুদের ধরতে চেষ্টা করে। যার চোখ বাঁধা হয় সে হয় 'কানা'। অন্যরা 'মাছি'র মতো তার চারদিক ঘিরে কানামাছি ছড়া বলতে বলতে তার গায়ে ছোঁয়া দেয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। সে যদি কাউকে ধরতে পারে এবং বলতে পারে তার নাম তবে ধৃত ব্যক্তিকে কানা সাজতে হয়।

ইচিং বিচিং

ইচিং বিচিং বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় গ্রামীণ খেলা। গ্রাম সংলগ্ন

ইচিং বিচিং

সবুজ মাঠে শিশু-কিশোররা এ খেলা খেলে থাকে। উচ্চতা অতিক্রম এই খেলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ খেলার ছড়া:

ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা।

দুজন খেলোয়াড় সামনাসামনি বসে খেলোয়াড়দের অতিক্রম করার জন্য উচ্চতা নির্মাণ করে দেয়। প্রথমে তারা দুপা দিয়ে উচ্চতা নির্মাণ করে। খেলোয়াড়রা উচ্চতা অতিক্রম করার পর তারা পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিয়ে উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে পায়ের উপর দুই হাত প্রসারিত করে উচ্চতা বাড়িয়ে তোলা হয়। উচ্চতা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়রা দুই পা মুক্ত করে ত্রিকোনাকার একটি সীমানা তৈরি করে। এই পায়ে ঘেরা স্থানটি পা তুলে দম বন্ধ করে বা ছড়া বলতে বলতে তিনবার অতিক্রম করে লাফ দিয়ে পার হতে হয়। এই সীমানা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়দের যুক্ত পাকে প্রতিটি খেলোয়াড় শূন্যে লাফিয়ে ইচিং বিচিং ছড়া বলতে বলতে দুইবার করে অতিক্রম করে। এটিই খেলার শেষ পর্ব।

ওপেন টু বাইস্কোপ

ওপেন টু বাইস্কোপ বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে অন্যতম। এটি একটি সহায়ক খেলা। দল গঠন করার জন্য এই খেলাটি খেলা হয়। এ খেলার ছড়া–

ওপেন টু বাইস্কোপ
নাইন টেন তেইশ কোপ
সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বলেছে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
স্প্রিং-এর চাবি আটা
যার নাম মনিমালা
তাকে দেব মুক্তার মালা।

দুজন দলপতি ফুল অথবা ফলের নামে নিজেদের দলের নাম নির্বাচন করে এবং দলের নামটা গোপন রাখে। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে একটি তোরণ নির্মাণ করে। খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে রেলগাড়ির মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছড়া বলতে বলতে এই তোরণের নিচ দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে। ছড়া শেষ হবার মুহূর্তে যে খেলোয়াড় তোরণের মধ্যে অবস্থান করে তাকে দলপতিরা হাতের মধ্যে বন্দি করে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কোন দলে যোগ দেবে। তখন সে তার পছন্দের দলে যোগ দেয়। এই ভাবে প্রতিটি খেলোয়াড় দুই দলে বিভক্ত হয়ে মূল খেলা শুরু করে। কখনো কখনো মূল খেলা হিসেবেই ওপেন টু বাইস্কোপ খেলাটি খেলা হয়ে থাকে।

লাঠি খেলা

লাঠি খেলা একটি ঐতিহ্যগত মার্শাল আর্ট যেটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কিছু জায়গায় চর্চা করা হয়। লাঠি খেলা অনুশীলনকারীকে 'লাঠিয়াল' বলা হয়। এছাড়াও, লাঠি চালনায় দক্ষ কিংবা লাঠি দ্বারা মারামারি করতে পটু কিংবা লাঠি চালনা দ্বারা যারা জীবিকা অর্জন করে, তাঁরা লেঠেল বা লাঠিয়াল নামে পরিচিতি পান।

লাঠি সাধারণত শক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় এবং কখনো কখনো একটি লোহার রিঙের সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় দুর্দান্ত অস্ত্রে পরিণত হয়।

লাঠি খেলা লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা শেখায়। ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলার জমিদাররা (পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গ) নিরাপত্তার জন্য লাঠিয়ালদের নিযুক্ত করত। চরাঞ্চলে জমি দখলের জন্য মানুষ এখনো লাঠি দিয়ে মারামারি করে। মহররম ও পূজাসহ বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে এই খেলাটি তাদের পরাক্রম ও সাহস প্রদর্শনের জন্য খেলা হয়ে থাকে। এই খেলার জন্য ব্যবহৃত লাঠি সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা এবং

প্রায়ই তৈলাক্ত হয়। অত্যাশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে প্রত্যেক খেলোয়াড় তাদের নিজ নিজ লাঠি দিয়ে রণকৌশল প্রদর্শন করে। শুধুমাত্র বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই এই খেলায় অংশ নিতে পারে।

লাঠিয়ালবাহিনী সড়কি খেলা, ফড়ে খেলা, ডাকাত খেলা, বানুটি খেলা, বাওই ঝাঁক (গ্রুপ যুদ্ধ), নরি বারী (লাঠি দিয়ে উপহাস যুদ্ধ) খেলা এবং দাও খেলা (ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপহাস যুদ্ধ) দেখায়। এর মধ্যে ডাকাত খেলার উপস্থাপনা ঈদে জনপ্রিয় খেলা হিসেবে প্রসিদ্ধ। লাঠিখেলার আসরে লাঠির পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোলক, কর্নেট, ঝুমঝুমি, কাড়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এবং সংগীতের সাথে চুড়ি নৃত্য দেখানো হয়।

লাঠি খেলার অসাধারণ ইতিহাস আছে কিন্তু এর জনপ্রিয়তা এখন পড়তির দিকে। ঈদ উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, নড়াইল প্রভৃতি জেলায় ভিন্ন নামে দেখা যেত।

কাবাডি

কাবাডি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা । বর্তমানে কাবাডি আন্তর্জাতিক ভাবেও খেলা হয়। এই খেলা সাধারণত কিশোর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সব ধরনের ছেলেরা খেলে থাকে। কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। পূর্বে কেবলমাত্র গ্রামে এই কাবাডি খেলার প্রচলন দেখা গেলেও বর্তমানে সব জায়গায় কাবাডি খেলা প্রচলিত হয়েছে।

কাবাডি খেলার বালকদের মাঠ লম্বায় ১২.৫০ মিটার ও চওড়ায় ১০ মিটার হয়। বালিকাদের কাবাডি খেলার মাঠ লম্বায় ১১ মিটার এবং চওড়ায় ৮ মিটার হয়। খেলার মাঠের মাঝখানে একটি লাইন টানা থাকে যাকে মধ্যরেখা বা চড়াই লাইন বলে। এই মধ্যরেখার দুই দিক দুই অর্ধে দুটি লাইন টানা হয় যাকে কোল লাইন বলে। মৃত বা আউট খেলোয়াড়দের জন্য মাঠের দুই পাশে ১ মিটার দূরে দুটি লাইন থাকে যাকে লবি বলা হয়। প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়। কিন্তু প্রতি দলে ৭ জন খেলোয়াড় একসাথে মাঠে নামে। বাকি ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে থাকে। খেলা চলাকালীন সর্বাধিক তিন জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

৫ মিনিট বিরতি সহ দুই অর্ধে পুরুষদের ২৫ মিনিট করে এবং মেয়েদের ২০ মিনিট করে খেলা হয়। খেলা শেষে যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে সেই দলই জয়ী হবে। দুদলের পয়েন্ট সমান হলে দুঅর্ধে আরো ৫ মিনিট করে খেলা হয়। এরপরেও যদি পয়েন্ট সমান থাকে তবে যে দল প্রথম পয়েন্ট অর্জন করেছিল সে দলই জয়ী হয়।

কাবাডি

পয়েন্ট: যদি কোনো খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে যায় তাহলে সে আউট হবে। এভাবে একটি দলের সবাই আউট হলে বিপক্ষ দল একটি লোনা (অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট) পাবে। মধ্যরেখা থেকে দম নিয়ে বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়কে (একাধিক হতে পারে) স্পর্শ করে এক নিশ্বাসে নিরাপদে নিজেদের কোর্টে ফিরে আসতে পারলে, যাদেরকে স্পর্শ করবে সে বা তারা আউট হবে। এভাবে যতজন আউট হবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক পয়েন্ট পাওয়া যাবে।

এক নিশ্বাসে স্পষ্টভাবে পুনঃপুনঃ কাবাডি বলে ডাক দেওয়াকে 'দম নেওয়া' বলে। এই দম মধ্যরেখা থেকে শুরু করতে হবে। বিপক্ষ কোর্টে একসাথে একাধিক আক্রমণকারী যেতে পারবে না। কোনো আক্রমণকারী বিপক্ষ দলে কোর্টে দম হারালো এবং বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তাকে স্পর্শ করতে পারলে সে আক্রমণকারী আউট বলে গণ্য হবে।

কুতকুত

কুতকুত গ্রামীণ কিশোরী-তরুণীদের অন্যতম প্রধান খেলা। বর্ষার পরে নরম মাটিতে মাটির ভাঙা তৈজসপত্রের অংশ দিয়ে দাগ কেটে কুতকুতের জন্য ঘর বানানো হয়। বাংলার গ্রামের মেয়েরা যে-কোনো ঋতুতেই এই খেলা খেলে থাকে। সুর করে কুতকুত গেয়ে বা বিভিন্ন ছড়া কেটে এ খেলা করা হয়।

লাইলি লুইলি বাঁশের চোঙ
বাঁশ কাটলে টাকা থোং
এত টাকা নেব না
লাইলির বিয়া দিব না
লাইলির আম্মা কাঁন্দে
গলায় রশি বান্দে।

আয়তক্ষেত্রাকার মোট ৭/৮ টি ঘর আঁকা হয় এবং এই ঘরগুলোর শেষ মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতির আর একটি ঘর বানানো হয়। প্রথম ঘরে গুটি ফেলে এক পা শূন্যে রেখে এবং দম দিতে দিতে গুটিকে সবগুলো ঘর অতিক্রম করিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঘরে এনে পা নামিয়ে দম ফেলতে হয়। তার পর এই ঘর থেকে গুটিকে পা দিয়ে আঘাত করে সব ঘর অতিক্রম করানোর চেষ্টা করতে হয়। গুটিটি সব ঘর অতিক্রম না করলে অর্ধাচন্দ্রাকৃতির ঘর থেকে বের হয়ে শূন্যে এক পা তুলে দম নিতে নিতে তাকে আবার আগের নিয়মে ঘর থেকে বের করে আনতে হয়। এভাবে প্রতিটি ঘরে গুটি ফেলে চাঁদঘর ঘুরিয়ে আনা হলে খোলায়াড়রা কপালে গুটি রেখে উপর দিকে তাকিয়ে ৮ ঘরের দাগে পা না ফেলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঘরে যেয়ে আবার প্রথম ঘরে ফেরত আসতে পারলে সে ঘর কেনার যোগ্যতা অর্জন করে। গুটি ফেলার সময় বা চালানোর সময় ঘরের দাগে বা বাইরে পড়লে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী খেলার সুযোগ পাবে। কুতকুত খেলায় যে ঘর কেনা হবে সে ঘরে পা বা গুটি ফেলা যাবে না। ঘরের বাইরে পিছন ফিরে গুটি ফেলে ঘর কিনতে হয়। ঘর কেনার প্রক্রিয়াকালীন সময় খেলোয়াড়ের দাঁত দেখা গেলে ঐ খেলোয়াড়ের খেলা ঐ অবস্থায় মারা যায়। ক্রমান্বয়ে ঘর কিনে শেষ ঘরটি দখল করার মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি হয়।

গোল্লাছুট

গোল্লাছুট বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। গ্রাম ছাড়াও বাংলাদেশের শহরাঞ্চলেও এই খেলা ব্যাপক প্রচলিত। ঢাক, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা, পাবনায় এই খেলার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এই খেলা স্কুলের মাঠ অথবা খোলা জায়গায় শিশুরা খেলে থাকে। গোল্লাছুট খেলায় দুটি দল থাকে। মাটিতে এক জায়গায় গর্ত করে একটি লাঠি পুতে তাকে কেন্দ্র হিসেবে

ধরা হয়, এই লাঠিকে কেন্দ্র করে বৃত্ত তৈরি করে ২৫/৩০ ফুট দূরে আরো একটি রেখা টেনে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। প্রথমে খেলোয়াড় ভাগ করা হয়। দুদলেই সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে (৫ থেকে ৭ জন)। একজন মাটিতে পুঁতা কাঠি এক হাতে ধরে বা কেন্দ্র স্পর্শ করে অন্য হাতে তার দলের অন্য খেলোয়াড়ের হাত ধরে ঘুরতে থাকে। তাদের লক্ষ্য হলো বৃত্তের বাইরে যে কাঠি বা গাছ (দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু) থাকে তা দৌড়ে স্পর্শ করা।

অপরদিকে দৌড়ে কাঠি স্পর্শ করার আগেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যদি ওই দলের কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সে এই দানে (পর্ব) খেলা থেকে বাদ যাবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত সবাইকে দৌড়ে কাঠি স্পর্শ করতে হবে। শেষ খেলোয়াড় লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলে প্রতিপক্ষ দান পায়।

বউচি

বউচি বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী খেলা। বউচি খেলায় দুইটি দলের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক দলে ৮ থেকে ১০ জন করে খেলোয়াড় হলে খেলা জমে। মাঠ অথবা বাড়ির উঠানে যেখানে খুশি সেখানে এটি খেলা যায়। খেলার প্রারম্ভে ২০-২৫ ফুট দূরত্বে মাটিতে দাগ কেটে দুটি ঘর তৈরি করতে হয়। দুই দলের মধ্যে যারা প্রথমে খেলার সুযোগ পায় তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বউ বা বুড়ি নির্বাচন করা হয়। দুটি ঘরের মধ্যে একটি ঘর হবে বড়ো যেখানে এক

বউচি

পক্ষের বউ বাদে সব খেলোয়াড় থাকবে। আর ছোটো ঘরে দাঁড়াবে বউ। বউয়ের বিচক্ষণতার ওপর খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে। বউঘর থেকে বউকে ছুটে আসতে হবে বড়ো ঘরটিতে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা সব সময় পাহারায় থাকে যেন বউ ঘর থেকে বের হতে না পারে। বউ বাইরে এলে যদি বিপক্ষ দলের কেউ তাকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে ওই পক্ষের খেলা শেষ হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে বিপক্ষ দল খেলার সুযোগ পাবে। বড়ো ঘরটিতে যারা থাকে তারা দম নিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের তাড়া করে। বিপক্ষ খেলোয়াড়রা দিকবিদিক ছুটে পালায়। তা সত্ত্বেও সবসময় খেয়াল রাখে বউ যেন যেতে না পারে। দম নিয়ে যাওয়া খেলোয়াড় যদি বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে দেয় তবে সে খেলোয়াড় মারা পড়ে। মারা পড়া খেলোয়াড় চলতে থাকা খেলায় অংশ নিতে পারে না। এভাবে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় মেরে বউকে বড়ো ঘরে আসতে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে বউয়ের সঙ্গী খেলোয়াড়রা। বউ যদি বিনা ছোঁয়ায় বড়ো ঘরে চলে আসতে পারে তাহলে বিজয় অর্জন হয়। বিজয়ী দল পুনরায় খেলা শুরু করবে। যদি বউকে বিপক্ষ দল ছুঁয়ে দেয় তাহলে বিপক্ষ দল খেলার সুযোগ পাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে খেলা চলতে থাকে।

টোপাভাতি

টোপাভাতি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় একটি খেলা। সাধারণত শিশুরা এই খেলা খেলে থাকে। টোপা মানে হাঁড়ি বা রান্না করার বাসন এবং ভাতি হলো ভাত রান্না করা। এজন্য রান্না করার এ খেলাকে টোপাভাতি বলা হয়।

প্রথমে শিশুরা পাটকাঠি বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছোটো ঘর তৈরি করে। এরপর এর উপরে গাছের পাতা, কলা পাতা অথবা পলিথিন দিয়ে ছাউনি দেয়। প্রথমে একজনকে কাছেই কোথাও কাল্পনিক বাজারে পাঠানো হয়। সে বাজার থেকে বিভিন্ন কাল্পনিক দ্রব্যাদি কিনে আনে। একজন গৃহিনী থাকে। সে রান্না করে সবাইকে খেতে দেয়। শিশুরা রান্নার জন্য সাধারণত খেলনা হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করে। খাওয়ার সময় থাল হিসেবেও গাছের পাতা ব্যবহার করে থাকে। এই খেলার মধ্যে গ্রামবাংলার পারিবারিক আবহ ফুটে ওঠে।

ডাংগুলি

ডাংগুলি বাংলাদেশের ও উত্তর ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রামীণ খেলা। সাধারণত কিশোর বয়সি ছেলেরা এই খেলা খেলে। ক্রিকেট আসার পর এর জনপ্রিয়তা অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে খেলাটি ড্যাংবাড়ি, গুটবাড়ি, ট্যামডাং, ভ্যাটাডাণ্ডা ইত্যাদি নামে পরিচিত। খেলার উপকরণ দুটি–একটি দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা লাঠি (ডাং বা ড্যাং), অপরটি গুলি, যা নামে গোল মনে হলেও গোল নয়, আসলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আরেকটি ছোটো লাঠি যার দুই প্রান্তে কিছুটা সরু করা থাকে।

দুই থেকে পাঁচ-ছয়জন করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে এটি খেলতে পারে। প্রথমে মাঠে একটি ছোটো গর্ত করা হয়। যারা দান পায় তাদের একজন গর্তের ওপর গুলি রেখে ডাণ্ডা মেরে সেটিকে দূরে ফেলার চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে সেটিকে লুফে নিতে চায়। তারা সফল হলে ঐ খেলোয়াড় আউট হয়, আর ধরতে না পারলে গর্তের ওপর রাখা ডাণ্ডা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারতে হয়। ছোঁয়া গেলে সে আউট হয়, আর তা না হলে সে ডাণ্ডা দিয়ে তুলে গুলিকে আবার দূরে পাঠায় । তারপর গুলি থেকে গর্ত পর্যন্ত ডাণ্ডা দিয়ে মাপতে থাকে। সাত পর্যন্ত মাপের আঞ্চলিক নাম হলো: এড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চাঘল, চাম্পা, ঝেঁক, মেক। এরূপ সাত মাপে এক ফুল বা গুট এবং সাত ফুলে এক লাল হয়। ভাঙা ফুলের ক্ষেত্রে যেখানে শেষ হয়, পরের খেলা সেখান থেকে শুরু হয়। এড়ি, দুড়ি ইত্যাদি প্রতিটি মারের পৃথক পৃথক পদ্ধতি আছে। আউট না হওয়া পর্যন্ত একজন খেলোয়াড় খেলতে পারে, আউট হলে দ্বিতীয় একজন একই পদ্ধতিতে খেলবে। এভাবে সবাই আউট হয়ে গেলে বিপক্ষ দল দান পেয়ে খেলা শুরু করে । বস্তুত এ খেলাটি বর্তমান যুগের ক্রিকেটের গ্রাম্য সংস্করণ এবং ব্যাট ও বল ডাণ্ডা ও গুলির সমতুল্য। এক্ষেত্রেও ক্যাচ হলে অথবা ডাণ্ডার আঘাত করে আউট করার বিধান আছে।

দাঁড়িয়াবান্ধা

দাঁড়িয়াবন্ধা বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে একটি পরিচিত খেলা। এ দেশের সর্বত্র স্থানীয় নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এ খেলা হয়ে থাকে।

শিশু-কিশোর-যুবকরা অবসর সময়ে বাড়ির পাশের খোলা মাঠে এ

খেলা খেলে থাকে। দ্রুত দৌড় ও বুদ্ধিমত্তায় এ খেলায় জেতা যায়। এ দলে ৫ জন খেলোয়াড় থাকে। এ খেলায় সময় নির্ধারণ থাকে না।

৬০/৭০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া করে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে একটি ঘর করতে হয়। এ ঘরটিকে আড়াআড়ি ৫ ভাগ করে ৪টি দাগ কাটতে হয়। আড়াআড়ি দাগগুলোর মাঝে ১০ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হয় যাতে এ দাগে দাঁড়িয়ে বাধা প্রদানকারী পা দুপাশের দাগ স্পর্শ না করে। প্রথম ঘরটি এভাবে দুভাগ করতে হয়। এ ডানপাশেরটি ফুল ঘর ও বাম পাশেরটি লবণ ঘর। একদল খেলোয়াড় প্রতি দাগে দাঁড়িয়ে বাধা দেবে। আরেক দল ফুল ঘর থেকে বের হয়ে সকল ঘর ঘুরে এসে পুনরায় ফুল ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। যে-কোন একজন খেলোয়াড় কৌশলে ফুল ঘরে প্রবেশ করতে পারলেই খেলার পয়েন্ট হয়। আবার বিরুদ্ধ দলের কোনো খেলোয়াড় যদি একজন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে তারা খেলার সুযোগ পায়। এভাবে খেলা চলতে থাকে। যে দল পয়েন্ট বেশি করে তারা জিতে যায়।

নুনতা খেলা

বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের শিশু-কিশোররা এই খেলা খেলে থাকে। এই খেলা সাধারণত দলবেঁধে খেলতে হয়। দল যত ভারী হয় খেলা তত মজা হয়। নুনতা খেলায় একজন একটি বৃত্তাকার ঘরের মালিক থাকে এবং তাকে অন্যদের দৌড়ে ধরতে হয়।

নুনতা খেলায় প্রথমে মাটিতে দাগ কেটে বৃত্তাকার ঘর বানানো হয়। এরপর একজনকে 'নুনতা' নির্বাচন করা হয় ও সে ঘরের বাইরে থাকে। অন্যরা ঘরের ভেতরে অবস্থান করে । নুনতা ঘরের বাইরে থেকে ছড়া কাটতে থাকে 'নুনতা বলোরে'। অন্যরা সমস্বরে বলতে থাকে 'এক হলোরে'। এভাবে নুনতা সাত পর্যন্ত বলার পর অন্যদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। প্রশ্ন করা শেষ হলে ঘরের ভেতর থেকে সবাই দৌড়ে পালায় ও নুনতা সেই ঘর দখল করে।

এরপর নুনতা শ্বাস বন্ধ করে গুণ-গুণ শব্দে বা ছড়া কাটতে কাটতে বের হয়ে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। যাকে প্রথম ধরতে পারে সে এসে নুনতার সাথে যোগ দিয়ে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে আর এভাবেই নুনতার দল ভারী হয়। যে সবার শেষে ধরা পড়ে, সে পরবর্তী পর্বের জন্য ঘরের মালিক হয়। এখানে উল্লেখ্য, নুনতা যদি দৌড়ানো অবস্থায় শ্বাস নেয় তাহলে অন্যরা তাকে ছুঁয়ে দেয় এবং ঘরে পৌঁছানো না পর্যন্ত পিঠে মারতে থাকে। নুনতা খেলার সময় যে ছড়াটি বলতে হয়–

নুনতা বলোরে
এক হলোরে
নুনতা বলোরে
দুই হলোরে....(এভাবে সাত পর্যন্ত)
– আমার ঘরে কে?
– আমি রে।
– কি খাচ্ছ
– লবণ খাই।
– লবনের সের কত?
– এইটা
– লবণের দাম দিবি কবে?
– লাল শুক্কুরবারে (শুক্রবার)।
– কয় ভাই? কয় বোন?
– পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন।
– একটা বোন দিয়ে যা
– ছুঁতে পারলে নিয়ে যা।

নৌকা বাইচ

নৌকা বাইচ হলো নদীতে নৌকা চালনার প্রতিযোগিতা। একদল মাঝি নিয়ে একেকটি দল গঠিত হয়। এমন অনেকগুলো দলের মধ্যে নৌকা দৌড় বা নৌকা চালনা প্রতিযোগিতাই হলো নৌকা বাইচ। নৌকার দাঁড় টানা ও নৌকা চালনার কৌশল দিয়ে প্রতিযোগিতা জয়ের জন্য খেলেন বা বাজি ধরেন। নৌকাবাইচে প্রতিটি নৌকার দুই পাশে বৈঠা হতে কয়েকজন নাবিকের একটি দল থাকে। প্রতি দলে একজন দলনেতা থাকে। একসাথে দাঁড় বা বৈঠা ফেলার জন্য একজন ঘন্টাবাদক থাকে ঘন্টার তালে তালে বৈঠা ফেলে নৌকা চালানো হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আনন্দ আয়োজন, উৎসব ও খেলাধুলা সবকিছুতেই নদী ও নৌকার সরব আনাগোনা। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বাংলাদেশের নৌকা বাইচ।

পুতুল খেলা

পুতুল খেলা বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। এটি সাধারণত মেয়েরা বেশি খেলে থাকে। দেশের সর্বত্রই পুতুল খেলা সমান জনপ্রিয় । পুতুল খেলেনি এমন মেয়ে বাংলাদেশে নেই বললেই চলে।

পুতুল সাধারণত মানবাকৃতিতে মাটি, কাঠ অথবা কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। পুতুল শিশুরা বাড়িতে বসেই তৈরি করে। এছাড়া বিভিন্ন মেলা, যেমন– বৈশাখি মেলা, পূজা, রথের মেলা, পৌষ সংক্রান্তি, চড়ক পূজা, শিবরাত্রি, মহররম, ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় পুতুল বিক্রি করা হয়। এছাড়া বর্তমানে মাটির পুতুলের সাথে সাথে প্লাস্টিকের পুতুলও অনেক পাওয়া যায়।

পুতুল খেলা

প্রথমে নানা রকমের পুতুল কাপড় অথবা রং দিয়ে সাজানো হয়। এরপর মেয়ে পুতুলকে গয়না দিয়ে কনে সাজানো হয় এবং ছেলে পুতুলকে বর সাজিয়ে শিশুরা তাদের বিয়ে দেয়। রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন, মেয়ে পুতুলের সাথে ছেলে পুতুলের বিয়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের অভিনয় করেই খেলা হয় পুতুল খেলা। আসলে পুতুল খেলার মধ্যে পুরো সংসারের একটা ছবি ফুটে ওঠে। পুতুলগুলোকে ছোটো শিশুরা তাদের সন্তান মনে করে। তারা পুতুলদের মায়ের মতোই আদর স্নেহ দিয়ে আগলে রাখে। শুধু তাই নয়, শিশুরা পুতুলদেরকে আবার শাষণও করে। পুতুল খেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব হলো একজনের

মেয়ের সঙ্গে আরেক জনের ছেলে পুতুলের বিয়ে দেওয়া।

ফুল টোকা

ফুল টোকা বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের অন্যতম খেলা। বাড়ির আঙিনাতে কিংবা স্কুলের মাঠে মেয়েরা ফুল টোকা খেলে থাকে। শিশু বয়স থেকে কৈশোর পর্যন্ত এই খেলায় অংশ নেয় গ্রামের মেয়েরা। এই খেলায় কোনো উপকরণ লাগে না। দলপতিসহ দুই দলে ভাগ হয়ে কিছুটা দূরত্বে মুখোমুখি বসে এই খেলা খেলতে হয়। দুই দল নিজেদের খেলোয়াড়দের নাম ফুল অথবা ফলের নামে রেখে থাকে। দলপতি অপর পক্ষের যে-কোনো খেলোয়াড়ের চোখ দুই হাতে চেপে ধরে সাংকেতিক নামে তার একজন খেলোয়াড়কে ডাকে। সে খেলোয়াড় এসে চোখ ধরে রাখা খেলোয়াড়টির কপালে আলতো করে টোকা দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। চোখ খোলার পর ঐ খেলোয়াড়কে যে টোকা দিয়েছে তাকে শনাক্ত করতে হয়। সফল হলে সে সামনের দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে বসে। এইভাবে যে দলের খেলোয়াড় লাফ দিয়ে প্রথমে সীমানা অতিক্রম করে সেই দলই জয়ী হয়।

বাঘ ছাগল খেলা

বাঘ ছাগল খেলা গ্রামীণ বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলা সাধারণত শিশুরা খেলে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই এই খেলা খেলে থাকে। এই খেলাটি কোনো কোনো জায়গায় অ্যাঙ্গা অ্যাঙ্গা খেলা নামেও পরিচিত।

বাঘ ছাগল খেলায় প্রথমে মাটিতে দাগ কেটে গোল বৃত্ত তৈরি করা হয়। এরপর দল থেকে একজনকে বাঘ নির্বাচন করা হয় এবং দলের বাকি খেলোয়াড় ছাগল হিসেবে বৃত্তের ভেতর অবস্থান করে। বাঘের কাজ হলো বৃত্তের বাইরে থেকে বৃত্তের ভেতর আক্রমণ করা এবং একটি ছাগল ছিনিয়ে নেওয়া। এভাবে বাঘ একজন একজন করে নিয়ে তার দল ভারী করে। শেষ পর্যন্ত যে ছাগল বৃত্তের ভিতরে টিকে থাকতে পারে, সে পরবর্তী দানের জন্য বাঘ নির্বাচিত হয়।

বাঘ ছাগলকে আক্রমণ করার সময় বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে। কোনো ছাগলকে আক্রমণ করলে ছাগলদের অন্য সদস্যরা তাকে টেনে ধরে রাখে। খেলা চলতে থাকে দুই পক্ষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। বাঘ প্রথমে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, অ্যাঙ্গা, অ্যাঙ্গা । এরপর ছাগলরা সমস্বয়ে বলে, 'কান্দো ক্যান?' এভাবেই কথোপকথনের মাঝেই বাঘ ছাগল দলকে আক্রমণ করে।

বাঘ: অ্যাঙ্গা, অ্যাঙ্গা।
ছাগদল: কান্দো ক্যান?
বাঘ: গরু হারাইছে
ছাগদল: কি গরু?
বাঘ: নাঙ্গা গরু।
ছাগদল: শিঙ্গি কী?
বাঘ: কুষ্টার আঁশ।
ছাগদল: একটা গান গাও, শুনি
বাঘ: এতি চোর, বেতি চোর
চলে আয় আমার স্যায়না চোর।

মার্বেল খেলা

বাংলাদেশের গ্রামীণ কিশোর ছেলেদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা মার্বেল। কোনো কোনো অঞ্চলে মার্বেল খেলাকে বিঘত খেলাও বলে। সম্ভবত অভিভাবকদের নিষেধাজ্ঞাই এই খেলার প্রতি কিশোরদের অদম্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই খেলার নিষ্পত্তি হয় অন্যের মার্বেল খেলে জিতে নিজের করে নেবার মাধ্যমে ।

মার্বেল খেলার জন্য কমপক্ষে দুই জন খেলোয়াড় দরকার হয়। তিন, চার,পাঁচ বা সাতজন মিলেও খেলা যায়। পরিস্কার সমতল ভূমি এই খেলার জন্য উপযোগী। প্রথমে দুইটি রেখা টানতে হয়। রেখা থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে একটি গর্ত করতে হয় যেন একটি মার্বেল সেই গর্তে বসতে পারে। আঞ্চলিক ভাষায় রেখাটিকে 'জল্লা'(কোথাও 'জই' নামে পরিচিত) এবং গর্তটিকে 'কেপ' বলে। জল্লার বাইরে পা রেখে প্রত্যেকে একটি করে মার্বেল কেপে ফেলার চেষ্টা করে। যার মার্বেল কেপে পড়ে বা সবচেয়ে কাছে যায় সে প্রথমে দান পায়। সবাই প্রথমে যে দান পায় তার হাতে ২/৩/৪টি করে মার্বেল জমা দেয়। সে মার্বেলগুলো ছকের বাইরে বসে সামনের দিকে ওই গর্তের আশপাশে আলতো করে ছড়িয়ে দেয়। এরপর অন্য খেলোয়াড়রা একটা নির্দিষ্ট মার্বেলকে বলে 'বাদ'। অর্থাৎ ওই মার্বেলকে বাদ দিয়ে যে-কোনো মার্বেলকে অন্য একটি মার্বেল ছুড়ে দিয়ে স্পর্শ করতে হবে। যদি এমনটা পারে তাহলে ওই দান সে জিতে যায়। আর না পারলে পরবর্তী জন একইভাবে খেলার সুযোগ পায়। তবে 'বাদ' দেওয়া মার্বেল কিংবা অন্য একাধিক মার্বেলকে ছুড়ে দেওয়া মার্বেল স্পর্শ করলে ওই খেলোয়াড়কে ফাইন দিতে হয়। এবং দান জেতার জন্য পরবর্তী খেলোয়াড় ফাইন হওয়া মার্বেলসহ সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে খেলতে থাকে। যে কেউ দান জিতলে আবার পুনরায় খেলা শুরু হয়। এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ আত্মসমর্পণ করে কিংবা তার কাছের মার্বেল শেষ না হয়ে যায়।

মোরগ লড়াই

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় এই খেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ছেলেদের খেলা। গ্রামাঞ্চলে ছেলেদের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা।

লাটিম খেলা

মোরগ লড়াই খেলায় একদল ছেলে গোল হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দুই হাত দিয়ে অপর পা পিছনে ভাঁজ করে রাখতে হয়। রেফারি যখন বাঁশিতে ফুঁ দেন তখনই খেলোয়াড়রা একে অপরকে ভাঁজ করা পা দিয়ে মারতে থাকে। কেউ পড়ে গেলে সে বাতিল বলে গণ্য হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত তিনজন থাকে। তাদের মধ্যে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্ধারণ করা হয়।

লাটিম খেলা

লাটিম বাংলাদেশের অন্যতম একটি গ্রামীণ খেলার উপকরণ। আগে সুতার মিস্ত্রীরাই গ্রামের কিশোরদেরকে লাটিম বানিয়ে দিত। তারা সাধারণত পেয়ারা ও গাব গাছের ডাল দিয়ে এই লাটিম তৈরি করত। নির্বাচিত পাট থেকে লাটিমের জন্য লতি বা ফিতা বানানো হতো। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তুলা জাতীয় নরম কাঠ দিয়ে লাটিম এবং গেঞ্জির কাপড় দিয়ে লাটিমের ফিতা বানানো হয়। লৌহশলাকাকে অক্ষ বানিয়ে কাঠের বানানো গোলকটিকে খেলোয়াড় ২-৩ হাত দীর্ঘ

এক টুকরো দড়ি বা সুতলি দিয়ে অক্ষশীর্ষ থেকে ক্রমশ গোলকটিকে নিম্নার্ধ সুষমভাবে পেঁচিয়ে হাতের প্রধানত তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যবহার করে মাটিতে ছুড়ে মারে। লাটিমটি দড়ির প্যাঁচ ছেড়ে দ্রুত ঘুরতে থাকে। এটাই লাটিম খেলা। সাধারণত ৩ ধরনের লাটিম খেলা হয়। ১. বেল্লাপার ২. ঘরকোপ ও ৩. ঘুরতিকোপ।

বেল্লাকোপে একটি দাগ কেটে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নির্ধারণী খেলায় যে লাটিম পরাজিত হয় তাকে ঘর থেকে নিজেদের লাটিম দিয়ে আঘাত করে করে প্রতিযোগিরা সীমানা পার করে দেয়। ঘুর্ণায়মান লাটিম হাতে নিয়েও প্রতিযোগী লাটিমকে আঘাত করা যায়। মাটিতে রাখা লাটিমকে আঘাত করতে ব্যর্থ হলে ঐ লাটিমের স্থানে ব্যর্থ লাটিমকে রাখা হয় এবং তাকে বেল্লাপার করা হয়।

'ঘরকোপ' লাটিমের ফিতা ও লাটিম দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকার পর বৃত্তের ভিতর বন্দি লাটিমগুলোকে রাখা হয়। বৃত্তের ভিতরের লাটিমগুলোকে বাইরের মুক্ত প্রতিযোগীদের লাটিম দিয়ে আঘাত বা কোপ মেরে ক্ষত করাই এই লাটিম খেলার উদ্দেশ্য। ঘুরতি কোপ প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন লাটিম ঘুরিয়ে দেয় আর অন্যরা তাদের লাটিম ঘুরিয়ে ওটাকে আঘাত করার চেষ্টা করে। এভাবে সবাই একবার করে ঘোরায়।

লুডু খেলা

লুডু খেলা বাংলাদেশের অন্যতম বিনোদন হিসেবে বিবেচিত। ঘরের বিছানা অথবা মাটিতে মাদুর পেতে কৈশোর অতিক্রান্ত ছেলেমেয়েরা এ খেলাটি খেলে থাকে। এই খেলাটির সরঞ্জাম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয়। গ্রামের বিবাহিত মহিলারাও অবসর সময়ে এই খেলাটি খেলে থাকে।

লুডু বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যে সকল লুডু খেলার প্রচলন বাংলাদেশে দেখা যায় তা হলো–

ঘর লুডু
সাপ লুডু
পৃথিবী ভ্রমণ লুডু

ঘর লুডু: এই খেলায় প্রতিটি প্রতিযোগীর চারটা করে গুটি থাকে, প্রতিটি খেলোয়াড় একটি নির্দিষ্ট ঘর দখল করে। যে প্রতিযোগী ডাইস চেলে প্রথম ছক্কা ফেলতে পারে সেই তার ঘর থেকে গুটি বের করে যাত্রা শুরু করতে পারে। প্রতিটি প্রতিযোগীকে এভাবে ঘর থেকে বের হয়ে পুরো ছক অতিক্রম করে নিজের ঘরে ফিরে এসে গুটি পাকাতে হয়। যার সবগুলো গুটি নির্দিষ্ট ঘরে আগে পৌছায় সে বিজয়ী হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিজয়ী হয়।

সাপ লুডু: লুডু খেলার ছকের পেছনে সাপ খেলার ঘর আঁকা থাকে। এই খেলায় যে প্রতিযোগী ডাইস চেলে প্রথমে ১ (এক) ফেলতে পারে সে ঘর থেকে বের হবার সুযোগ পায়। এক থেকে একশ পর্যন্ত যে প্রতিযোগী যেতে পারে সেই জয়ী হয়। যে গুটি সাপের মুখে এসে পড়ে সাপ তাকে কেটে দেয় অর্থাৎ সাপের মুখ থেকে লেজ অঙ্কিত ঘরে পিছিয়ে আসে এবং যে গুটি মই-এর গোড়া অঙ্কিত ঘরে আসে সেটি মই বেয়ে মইয়ের উপরের ঘরটিতে পৌছে যায়।

পৃথিবী ভ্রমণ লুডু : পৃথিবী ভ্রমণ লুডুর মাধ্যমে বিশ্বকে জানা যায়। এ লুডুও একইভাবে খেলা হয়। বোর্ডে উড়োজাহাজ, টর্বেন, বাস ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। ছক্কায় এক ফোঁটা উঠলে গুটি ঘর থেকে বের হবে। এরপরে ছক্কায় যে নম্বরের ফোঁটা উঠবে সে নম্বরের সাহায্যে খেলোয়াড় সেই দেশে যাবে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী ঘুরে যে সকলের আগে পাক্কা ঘরে পৌছাবে সেই জয়ী হবে।

ষোলো গুটি

ষোলো গুটি বাংলাদেশের গ্রামীণ পুরুষদের অন্যতম খেলা। অলস অবসরে গ্রামের যুবক ও মধ্যবয়সি পুরুষেরা ষোলো গুটি খেলে। মাটিতে দাগ কেটে শুকনো ডাল ভেঙে গুটি বানিয়ে চলে এই দীর্ঘমেয়াদি খেলা।

সাধারণত মাটিতে দাগ কেটে ষোলো গুটির ঘর বানানো হয়। প্রতি পক্ষেই ১৬টি করে গুটি থাকে। শুরু ঘরের মাঝখানে দাগটি দান চালার জন্য খালি থাকে। কোণাকুণি দাগের গুটিগুলো সারা ঘর জুড়ে এক ঘর করে কোণাকুণি খেলতে পারে। উলম্ব দাগ কাটা ঘরের গুটিগুলো লম্বভাবে এক ঘর করে খেলতে পারে। অপর পক্ষের গুটিকে ডিঙাতে পারলেই সে গুটি কাটা পড়ে। এই ভাবে প্রতিপক্ষের গুটির সংখ্যা কমিয়ে শূন্য করে ফেলতে পারলেই খেলা শেষ হয়ে যায়। তবে অঞ্চলভেদে ১৩টি কিংবা নির্দিষ্ট সংখ্যক গুটি খেয়ে ফেলতে পারলেই খেলা শেষ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে খেলা শুরুর আগেই সংখ্যাটি ঠিক করে নেওয়া হয়। ষোলো গুটির আরেকটি রূপান্তর হলো বাঘ ছাগল খেলা। এক পক্ষ ষোলোটি গুটি নেয় এবং অন্য পক্ষ একটি গুটি নিয়ে বাঘ ছাগল খেলা খেলে। একটি গুটিকে বাঘ এবং ষোলোটি গুটিকে ছাগল বলে। বাঘের কোণাকুণি এবং লম্বালম্বি সব ধরনের গতিই বৈধ। ছাগল বা ষোলো গুটির চাল অন্য খেলার মতোই। ১৬ গুটি দিয়ে বাঘের চাল বন্ধ করে দিতে পারলেই খেলা শেষ হয়ে যায়। আর বাঘ চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের সবগুলো গুটিকে খেয়ে নিতে।

এক্কাদোক্কা

এক্কাদোক্কা বাংলাদেশের মেয়েদের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। মাটির ভাঙা হাড়ি বা কলসির টুকরা দিয়ে তৈরি চাড়া বা গুটি দিয়ে। বাড়ির উঠান কিংবা খোলা জায়গায় আয়তাকার দাগ কেটে খেলা হয় এক্কাদোক্কা। আয়তাকার ঘরের মধ্যে লম্বালম্বি দাগ টেনে দুইটি ও আড়াআড়ি দাগ টেনে তৈরি করা হয় আরো চারটি খোপ। পর্যায়ক্রমে এক এক করে প্রতিটি ঘরে চাড়া ছুঁড়ে ফেলতে হয়। তারপর এক পায়ে লাফ দিয়ে দাগে পায়ের স্পর্শ এড়িয়ে ঐ চাড়া পায়ের আঙ্গুলের টোকার সাহায্যে ঐ ঘর থেকে বের করে বাইরে আনতে হয়। চাড়া ছোঁড়ার পর নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে পড়লে, দাগের উপর পড়লে, পা দাগে লাগলে, চাড়া আঙুলের টোকার ফলে কোনো দাগের উপর পড়লে কিংবা দুই পাশের রেখা পার হয়ে গেলে খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। ফলে খেলার সুযোগ পায় দ্বিতীয় জন। এভাবে পর্যায়ক্রমে যে আগে সব ঘর পার হয়ে আসতে পারে সে এক্কাদোক্কা খেলায় জিতে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক্কাদোক্কা খেলার নিয়মে কিছু কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: নিচের দিকে না তাকিয়ে চাড়া কপালের উপর রেখে ঘর অতিক্রম করা, দাগে পা পড়লে আউট হওয়া আবার কোথাও দম নিয়ে শেষ ঘরটি পার হয়ে না ঘুরে চাড়াটি ছুঁড়ে মারা হয়।

লুডু খেলা

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

সাধারণ মানুষের অসাধারণ কবি

এমরান চৌধুরী

আমি কবি যত কামারের
আমি কবি যত কুমারের
আমি কবি যত মুটে আর মজুরের।

এমন সহজ-সরলভাবে ছোটোদের কথা বলে গেছেন যিনি, তিনি আর কেউ নন, আমাদের জাতীয় কবি, গণমানুষের কবি, বাংলা সাহিত্যে একমাত্র দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আজ থেকে একশ আঠারো বছর পূর্বে ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে, বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ফকির আহমেদ, মা জাহেদা খাতুনের দ্বিতীয় সন্তান নজরুল। নজরুলের জন্মের আগে পর পর তার ক'ভাই অকালে মারা যান। তাই যখন তাঁর জন্ম হয় তখন মা-বাবা বড়ো দুঃখের ধন বলে নাম রাখেন দুখু মিয়া। এমনিতে পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তার ওপর মাত্র নয় বছর বয়সেই বাবাকে হারান। ফলে যে বয়সে হেসেখেলে বই-খাতা নিয়ে হৈহুল্লোড় করে দিন কাটানোর কথা সে বয়সেই তাঁকে দু'বেলা ভাতের জন্য ধরতে হয় সংসারের হাল। অভাব, অনটন, সংসারের টানাপড়েন সত্ত্বেও তাঁর ভেতর শৈশবেই অঙ্কুরিত হয় লেখনীর বীজ। চরম দারিদ্র্য ও অবহেলার মাঝেও সে বীজ ধীরে ধীরে পল্লবিত ও বিকশিত হয়। তাই তিনি লিখেছেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান। তুমি মোরে দানিয়েছ খ্রিষ্টের সম্মান'।

দারিদ্র্যের সাথে লড়াকু সৈনিক নজরুল সোনার চামচ মুখে জন্ম না নিলেও বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ তাঁর সোনাঝরা লেখনী দিয়ে। বড়োদের পাশাপাশি তিনি ছোটোদের জন্যও লিখেছেন বিস্তর। নজরুলের শিশুতোষ প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। যার নাম *ঝিঙেফুল*। দ্বিতীয়টির নাম *পুতুলের বিয়ে* প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। এর মধ্যে প্রথমটি ১৪টি কবিতার সংকলন, দ্বিতীয়টি ছয়টি নাটিকা ও ৩টি কবিতার সংকলন। পঞ্চাশের দশকে বের হয় তাঁর কিশোর রচনার বাছাই করা সংকলন *সঞ্চয়ন* (১৯৫৫)। ষাটের দশকে বের হয় *ঘুম জাগানো পাখি* (১৯৬৪), *ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি* (১৯৬৫) এবং পুতুলের বিয়ের সঙ্গে কয়েকটি কবিতা যুক্ত করে প্রকাশিত হয় *পিলে পটকা* ও *পুতুলের বিয়ে*।

নজরুল সাহিত্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক নজরুলের কবিতা ও গান। বাংলা ও বাঙালির যে-কোনো দুঃসময়ে বাঙালিকে সাহস জুগিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে তাঁর গান, তাঁর কবিতা। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'চল্ চল্ চল্'- এর প্রথম ২১ লাইন বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা* (১৯২২), প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *বাঁধনহারা* (১৯২৭), প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২২), প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ *যুগবাণী* (১৯২২), প্রথম প্রকাশিত নাটক *ঝিলিমিলি*। এছাড়া তাঁর প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থের নাম *বিষের বাঁশি* (১৯২৪)। *মরু ভাস্কর* এবং *চিত্তনামা* তাঁর উল্লেখযোগ্য জীবনভিত্তিক কাব্য। *মরুভাস্কর* আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর লেখা।

নজরুলের লেখা গান প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় ১৯২৮ সালে *বুলবুল* নামে। এরপর ১৯৩০ সালে *মহুয়ার গান*। ১৯৩১ সালে *চন্দ্রবিন্দু*। ১৯৩২ সালে *সুরসাকী*, *বনগীতি* ও *জুলফিকার*। ১৯৩৩ সালে *গুলবাগিচা*, ১৯৩৪ সালে *গীতি শতদল* ও *গানের মালা* প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে *বুলবুল* (২য় খণ্ড), ১৯৬৬ সালে *রক্তজবা*, ১৯৬৯ সালে *গীতিমালা* এবং ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় *সন্ধ্যামালতী* নামক সংগীত গ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর *শিউলি মালা* নামে আরো একটি গানের বই প্রকাশিত হয়, যেটি প্রকাশের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর লেখা ৩৬০০টির মতো গান রেকর্ডেই গাওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো কবি নেই, যিনি নজরুলের চেয়ে বেশি গান লিখেছেন। এই একটি জায়গায় তিনি বাংলা সাহিত্যের বিশাল মহিরুহ রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

পৃথিবীর লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের জয়গান গেয়েছেন নজরুল। সমাজের হতদরিদ্র, অধিকার বঞ্চিত মানুষের কথা এত উচ্চকিত এবং স্পষ্ট ভাষায় নজরুলের কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হয়:

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সে দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না;
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।

তাঁর গানের মধুময় সুরে, আবেগময় বাণীতে আশাহত মানুষ পেয়েছেন আশা। শোষিত-নিপীড়িত-নিম্নস্থিত মানুষের অধিকারের কথা জোরালোভাবে তিনি তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন, বার বার বলেছেন। বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, ক্ষোভ অত্যন্ত জীবন্তভাবে উঠে এসেছে তাঁর গানে। তাঁর গান একদিকে যেমন হৃদয় ছুঁয়ে যায়, অন্যদিকে করে তোলে ক্ষিপ্ত, বিদ্রোহী।

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজোর পাষাণভেদী।

এ জাতীয় গানের কলি বা কবিতা পাঠ মাত্রই পাঠকের রক্তশিরায় জাগায় শিহরণ, আধমরারা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। হাবাগোবা, ভীরু, কাপুরুষও হয়ে ওঠে মুহূর্তে সাহসী, প্রতিবাদী। বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে তখন কারো এতটুকু ভয়ের উদ্রেক হয় না। আনন্দ-বেদনায় যখন তাঁর গান কানে বাজে ফুলের পাগল করা সৌরভের মতো মানুষ বিমোহিত হয়। হারিয়ে যায় সুরের গভীরে, বাণীর অন্তরে।

জন্ম থেকে দুঃখ ও অভাবের সাথে সমানতালে লড়েছেন বলেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, চিনতে পেরেছেন সাধারণ মানুষকে। সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন আর দীনতার কথা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন লাখো লাখো ভাগ্যবঞ্চিত শিশু-কিশোরের কথাও। এক মুঠো ভাতের জন্য যাদের নিরন্তর খাটতে হয় জন্ম থেকেই। নিজের পেটে আগুন। তাই লক্ষ কোটি শিশুর পেটের আগুন ধরা দেয় তাঁর কলমে, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ/চায় দুটো ভাত আর একটু নুন, বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা/কচি পেটে তার জ্বলে আগুন। সত্যিই তো, বাংলা সাহিত্যে এভাবে গণমানুষের নাড়ির খবর কজনই-বা রেখেছেন। নজরুলই একমাত্র কবি যিনি হাঁড়ির খবর, নাড়ির খবর এমনভাবে তুলে এনেছেন– যা পাঠ মাত্রই হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আর তাই তিনি সাধারণ মানুষের অসাধারণ কবি।

লেখক : সাংবাদিক ও লেখক

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব

আলী আসিফ খান

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ যেন এক মহাকাব্য। বাঙালির প্রাণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বাণী। মার্কিন সাময়িকী *নিউজ উইকস* ৫ই এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যায় একটি নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics বা রাজনীতির কবি হিসেবে উল্লেখ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এমন সম্মানজনক উপাধীতে ভূষিত করেছিলো আন্তর্জাতিক মহল। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যতটুকু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি ছিল বঙ্গবন্ধুর।

তিনি দেশকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে রেখে প্রতিটি বাঙালির মুখে হাসি ফোটাতে বহুবার জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব না চেয়ে এ মহান নেতা শুধু বাঙালি জাতির অধিকারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কালো হাত থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বিজয়-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ যখন দৃঢ়পদে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পরিবার সহ এবং আমার নানা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (বঙ্গবন্ধুর ভগ্নীপতি), বড়ো খালা শেখ আর্জুমনি, ছোটো খালা বেবী সেরনিয়াবাতকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সেই ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পায়নি ছোট্ট শিশু সুকান্ত বাবু, ছোটো মামা আরিফ সেরনিয়াবাত ও শেখ রাসেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আমার মা হামিদা সেরনিয়াবাত সেইদিন ঘাতকের ১১টি গুলির আঘাত সহ্য করে ভাগ্যক্রমে কোনোমতে বেঁচে যান। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে আমার মাকে দিল্লিতে নিয়ে চিকিৎসা করালেও একটি পা হারিয়ে এখনও যন্ত্রণাময় জীবন নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছেন, যা আমাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে। জার্মানিতে থাকার সুবাদে ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধুর বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ১৯৯৬, ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে সরকার গঠন করে। জ্বালাও-পোড়াও প্রতিহিংসার কর্মকাণ্ড রুখে দিয়ে ২০১৪ সালের নির্বাচনের ফল ছিল জনগণের রায়।

দেশি বিদেশি সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ১৯৭১ সালের গণহত্যাকাণ্ডে জড়িত সকল যুদ্ধাপরাধীকে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের আওতায় এনে বিচার করে দেশ ও জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের উজ্জ্বলতম সাফল্য, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা কুড়ায়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারকে অনুসরণ করে রুয়ান্ডার সরকার সে দেশের গণহত্যায় জড়িত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে বিশ্বের নিকট বাংলাদেশের এ বিচারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছে।

বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যেখানে ইউরোপের মতো দেশগুলো মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত, সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় মনোবল ও দক্ষ কৌশলে এদেশের উপরে অর্থনৈতিক মন্দার কোনো প্রভাব পড়তে দেননি। চ্যালেঞ্জের সাথে ২০১৫ সালে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন দ্বিগুণ করে পে-স্কেল ঘোষণা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জিডিপি ৭.১১ এবং ১৬০২ ডলার মাথাপিছু আয় অর্জন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ২০১৬-২০১৭ সালে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫ ধরা হয়েছে। যানজট নিরসনে রাজধানীতে মেট্রোরেল প্রকল্প হাতে নিয়ে, বিভিন্ন স্থানে উড়াল সেতু নির্মাণ করে এবং হাতিরঝিল প্রকল্প সমাপ্ত করে নান্দনিক শহরে রূপান্তর করা হয়েছে ঢাকাকে।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি করে বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক বিজয়। ভারতের সাথে বন্দি বিনিময় চুক্তি ও স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন একটি বড়ো অর্জন। মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে কূটনীতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করে বাংলাদেশের শ্রমবাজার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিনামূল্যে বিতরণ করে শিক্ষার হার ৪৪ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পিতা-মাতা ও ভাইবোনদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (সর্ব ডানে) –ফাইল ছবি

২০১১ প্রণয়ন করা হয়। নারী জনশক্তি নির্ভর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। একটি বাড়ি একটি খামার, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা কমে ১২.৪%-এ দাঁড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন, অপরাধী যেই হোক না কেন তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায়

১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতু নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

আজ বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে। বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন, 'এদেশের মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না'। তাঁর এ ভবিষ্যৎ বাণী আজ সত্যি হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের সঠিক প্রচেষ্টা, কর্মদক্ষতা ও সুদৃঢ় পদক্ষেপে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

বঙ্গবন্ধু যেমন পরাশক্তির নিকট মাথানত করেননি, ঠিক তেমনি যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অশুভ শক্তির নিকট মাথা নত না করে নিজেদের অর্থায়নে বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্পটির উদবোধন করেন– যার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

সরকার কৃষিতে ভরতুকি ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ করতে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য সন্তান এবং তথ্য ও যোগাযোগ উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয়-এর নেতৃত্বে আইসিটি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং' প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবসমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বেকারত্বের অভিশাপকে দূর করে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে দেশের প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলে বর্তমান সরকার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে সৌরবিদ্যুৎ সহ বর্তমানে ১৫,৩৫১ মেগাওয়াট উৎপাদন করে ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু-১' ২০১৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর উৎক্ষেপণ করা হবে। টেন্ডারবাজি বন্ধে ই-টেন্ডার চালু যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২য় সাবমেরিন কেবল স্থাপন, মোবাইল ফোন কলরেট এবং ইন্টারনেটের দাম কমিয়ে ই-কমার্স ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা প্রসংশনীয় উদ্যোগ। ৯টি নতুন বেসরকারি ব্যাংক অনুমোদন দেওয়ায় জনগণ দ্রুত ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছে। সার্বিক তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল গত বিশ্বকাপে চ্যালেঞ্জিং খেলায় ক্রিকেট বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি শ্রীলংকার বিরুদ্ধে শততম টেস্ট খেলায় ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। খেলাধুলার উন্নয়নে প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

সাবমেরিন ক্রয়সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠন করা হয়েছে। ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো হয়েছে। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসার সাথে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ', 'সাউথ-সাউথ', এবং 'আইসিটি' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, 'যে একজন মানুষকে মারল, সে যেন গোটা মানবজাতিকে মারল।' কিন্তু একটি গোষ্ঠী জঙ্গীবাদের মদদ দিয়ে দেশকে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ধর্মবিরোধী এই গোষ্ঠী দেশে নিরাপরাধ মানুষ হত্যা করে বেহেশতে যাওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে সহজ-সরল মানুষের মগজধোলাই করে জঙ্গীবাদের ভয়ানক পথে টানছে। তারা বিশ্বে বাংলাদেশকে জঙ্গীবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে তৎপর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে তারা ব্যর্থ হবেই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উগ্র জঙ্গীবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারায় বিশ্বাসী বর্তমান সরকার তার ঐতিহ্য ধারাকে অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শোষণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ তথা শক্তিশালী, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে। অচিরেই এদেশ উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

লেখক: আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের দৌহিত্র

নিবন্ধ

১৪ই মে

বিশ্ব মা দিবস

আতিকুল বাশার

মা'কে ভালোবাসা জানানোর জন্য বিশেষ কোনো দিন বা ক্ষণের প্রয়োজন হয় না– তবুও 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হয়।

'মা' প্রেমীরা মা'কে শ্রদ্ধা আর গভীর ভালোবাসায় সিক্ত করতেই একটি দিন বেছে নিয়েছেন। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার স্পর্শ প্রত্যেক সন্তান প্রথম অনুভব করে। এই ব্যক্তিত্বকে নতুন করে ভালোবাসা জানানোর কোনো বচন প্রয়োজন হয় না। যুগ যুগ ধরে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার 'বিশ্ব মা দিবস' পালনের রেওয়াজ থাকলেও, বিশ্বের কিছু কিছু দেশে 'মা দিবস' বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পালিত হয়ে আসছে। মা দিবসের উদ্‌যাপন চলে আসছে সেই গ্রিক সভ্যতার যুগ থেকেই।

এ দিবসটি বাস্তবায়নে মায়ের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মা ভক্তরা প্রায় দেড়শ বছর পূর্ব থেকে লড়াই-সংগ্রাম করে এসেছেন। তার বাস্তব প্রতিফলন আমরা পেয়েছি ১৯১১ সাল থেকে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সর্বপ্রথম ১৯১১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার আমেরিকার সমস্ত প্রদেশজুড়ে পালিত হয় 'মা দিবস'। সেই থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে 'মা' দিবস হিসেবে।

১৯১১ সাল থেকে 'মা দিবস' পালিত হয়ে আসলেও দিবসটির পেছনে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। 'মাদার্স ডে' অথবা 'মা' দিবস'র জন্মকথা নিয়েও নানা তথ্য রয়েছে। ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের তরুণ-তরুণীরা মায়ের জন্য রোববার বাড়িতে ফিরত ছোটো-খাটো উপহার বা মাদারিং কেক কিনে। পরবর্তীতে 'মিড লেন্ট সানডে' থেকে পরিবর্তিত নাম হয় 'মাদারিং সানডে'। এই 'মাদারিং সানডে'র পরে আসে 'মাদার চার্চ'। সময়ের আবর্তনে 'মাদারিং সানডে' এবং 'মাদার চার্চ' উৎসব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পশ্চিমারা এই দিনটিতে মায়ের প্রতি চার্চের মতো করে সম্মান জানাতে শুরু করে।

জানা যায়, আমেরিকায় ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'মা দিবস' পালনের উদ্যোগে নেওয়া হয়। তৎকালীন সময়ে গোটা আমেরিকায় গোষ্ঠী ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে গৃহযুদ্ধ চলছিল। তখনকার এক নারী সমাজকর্মী 'জুলিয়া ওয়ার্ড হাউই' যুদ্ধের কবল থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে মায়ের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রচুর লেখালেখি শুরু করেন। তার লেখা *ব্যাটল হাইম অব দ্য রিপাবলিক* গ্রন্থটি ব্যাপক আলোচনার ঝড় তোলে। ওই সময় তিনি আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়ে 'মা' দিবসটি সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৮৭২ সালে রচনা করেন, 'মাদার্স ডে প্রোক্লামেশন' বা 'মা দিবসের ঘোষণাপত্র'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তার এই ঘোষণাপত্রকেই 'মা' দিবসের ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করা হয়। তিনি সে সময় আমেরিকায় মায়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'মাদারিং সানডে' নামে একটি বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করার প্রচলন শুরু করেছিলেন। ১৯০৫ সালে 'জুলিয়া ওয়ার্ড হাউই' মারা যান। তার মৃত্যুর পর মেয়ে অ্যানা মারিয়া রিভস জার্ভিস মায়ের অসমাপ্ত কাজকে স্মরণীয় করে রাখতে সচেষ্ট হন। ১৯০৭ সালে একদিন অ্যানা মারিয়া একটি স্কুলে দেওয়া বক্তব্যে মায়ের জন্য একটি বিশেষ দিন ঠিক করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অ্যানা মারিয়া রিভস জার্ভিস তার মা কর্তৃক ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদার্স ওয়ার্ক ডে' পালনের ধারণা থেকে এই অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তার অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯০৮ সালের ১০ই মে পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ফিনাডেলফিয়া, পেনসিলভেনিয়ায় প্রথম 'মা দিবস' পালিত হয়। নিজ মায়ের প্রতিষ্ঠিত 'সানডে স্কুলে' বাচ্চাদের তিনি বাইবেল পাঠ করাতেন। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হতো তার নিজের। এদের মুখাবয়বে খুঁজে পেতেন নিজ মায়ের মুখ। ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় বিনম্র হতে ইচ্ছে করত মায়ের প্রতি। এ বোধ থেকেই ১৯০৫ সালে মাকে ভালোবাসা ও সম্মান জানাতে মায়ের প্রতিষ্ঠিত 'সান ডে স্কুলে' প্রথম এ দিনটি 'মাদার্স ডে' বা 'মাতৃদিবস' হিসেবে প্রবর্তন করেন। আবার অনেকে মনে করেন, অ্যানা জারভিসের পূর্বে ১৮৮৭ সালের দিকে মেরী টাওলাস সাসসিন নামে একজন স্কুল শিক্ষক 'মাদার্স ডে' উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। ১৯০৪ সালে ফ্রান্সে 'মাদার ডে' নিয়ে প্রচারাভিযান শুরু করেন। এর তিন বছর পর অ্যানা মারিয়া রিভস জার্ভিস জাতীয়ভাবে 'মাদার্স ডে' পালনের উদ্যোগ নেন। তিনি মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে 'মাদার্স ডে' হিসেবে নির্ধারণ করেন, সে লক্ষ্যেই ১৯০৮ সালের ১০ই মে তিনি পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রাফটন শহরের সেই চার্চে, যেখানে তার মা রবিবারে পড়াতেন সেখানে প্রথ মবারের মতো দিনটি উদ্‌যাপন করেন। ১৯১০ সালে পূর্ব ভার্জিনিয়াতে সেই দেশের সরকার প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে 'মা দিবসে'র ঘোষণা দেন। ১৯১১ সাল থেকে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেই 'মা দিবস' পালিত হয়। আন্তর্জাতিক 'মা দিবস' সংগঠন ১৯১২ সাল থেকে 'মা দিবস' পালন করে আসছে এবং অ্যানা মারিয়া রিভস জার্ভিস মেরীকে 'মাদার্স ডে'র প্রবর্তক হিসেবে ঘোষণা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের কল্যাণে ১৯১৪ সালে 'মাদার্স ডে' সর্বপ্রথম জাতীয় স্বীকৃতি পায় এবং পরের বছর তিনি 'মাদার্স ডে' জাতীয়ভাবে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে মহীয়সী নারী অ্যানা মারিয়া রিভস জার্ভিস ইহধাম ত্যাগ করেন। মিস জার্ভিসের মায়ের প্রিয় ফুল ছিল 'কার্নেসন'। তাই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে মিস জার্ভিস এ ফুলকে বেছে নিয়েছিলেন। আজও প্রতি 'মাদার্স ডে'তে পশ্চিমারা তাই রক্তরাজ (লাল) কার্নেসন ফুল দিয়ে জীবিত মাকে এবং শ্বেতশুভ্র (সাদা) কার্নেসন দিয়ে মৃত মাকে শ্রদ্ধা জানান। সাধারণত সাদা কার্নেসন ফুলকে মা দিবসের প্রতীক বিবেচনা করা হয়। এই দিনে সন্তানরা ফুল এবং নানা সামগ্রী উপহার দিয়ে এবং বাসায় কিংবা রেস্টুরেন্টে মায়ের সঙ্গে খাবার খেয়ে, অনেকেই ছুটি নিয়ে মায়ের একান্ত সান্নিধ্যে দিনটি কাটায়। এরই ধারাবাহিকতায় আমেরিকার সাথে এবার ১৪ই মে 'মা দিবসটি' পালন করেছে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, রাশিয়া, জার্মানিসহ ৪০টি দেশ।

ফুল বিক্রেতা মায়ের কোলে শিশু

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

২৮শে মে : নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

নিরাপদ মাতৃত্বের ফসল সুস্থ মা সুস্থ সন্তান

সুলতানা বেগম

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৮শে মে সারাদেশে পালন করা হয় 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় দিবসটি। সারাবিশ্বে দিবসটি 'আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে পালিত হলেও মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযথভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো– নিরাপদ মাতৃত্বকে নারীর অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হার কমিয়ে আনা। সুস্থ মা, সুস্থ সন্তান নিরাপদ মাতৃত্বের ফসল এবং সুস্থ জাতি গঠনে অপরিহার্য।

মায়ের স্নেহের বাঁধনে শিশু

একজন নারীর পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। মানুষকে সুন্দর পৃথিবীতে আসার সূচনা থেকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত সুন্দর-সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেন গর্ভধারিণী মা। পৃথিবীর সর্ববহুল উচ্চারিত সর্বোত্তম শ্রুতিমধুর একটি অক্ষরের একটি শব্দ 'মা'। মা হলেন– জননী, জন্মদাত্রী, স্তন্যদায়ী এবং পালনকর্ত্রী। এই শব্দের মাঝে লুকিয়ে আছে জগতের শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, অকৃত্রিম ও অতুলনীয় ভালোবাসা। নিজের সুখ হারাম করে সন্তানকে মানুষ করার সার্বক্ষণিক চেষ্টা থাকে মায়েদের। সন্তানের নিরাপদ জন্ম ও সুস্থ জীবন নির্ভর করে মায়ের সুস্থতার ওপর। আর নিরাপদ স্বাস্থ্য মায়ের অধিকার। সন্তানকে এই সুন্দর পৃথিবীতে আনার জন্য মা সে সুযোগ করে দেয় ঝুঁকি নিয়ে, সেই মায়েদের কতটা নিরাপদে রাখা যাচ্ছে– তা ভাবার বিষয়। প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর একজন মায়ের জন্য লুকিয়ে থাকে মৃত্যুঝুঁকিসহ নানা আশঙ্কা। গর্ভবতী নারী সেবা পাওয়ার সব অধিকার রাখেন। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মা এবং নবজাতকের অবস্থা থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এ সময় মায়ের জীবন নিরাপদ রাখাই হচ্ছে নিরাপদ মাতৃত্ব। সুন্দর জীবন ও সুস্থ-সবল নবজাতকের জন্য নিরাপদ মাতৃত্বের বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নিরাপদ প্রসব বিষয়ে সকল সেবা পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিত করা। তা-না হলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের দেশে গর্ভকালীন নানাবিধ ঝুঁকিপূর্ণ জটিলতায় ভোগেন মায়েরা, যা মাতৃমৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী। মাতৃত্বকালীন অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ, পরিবারের অবহেলা, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, কিশোরী মায়ের রক্তস্বল্পতা, গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে অবহেলা, সুচিকিৎসার অভাব এবং নারী শিক্ষার অভাবের কারণে নারীর নিরাপদে মা হওয়ার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সুস্থ সন্তান জন্মদান এবং মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গর্ভধারণের আগে থেকেই নারীর প্রতি যত্নশীল হতে হবে পরিবারের সকলকেই। কারণ পরিবারের সচেতনতায় সম্ভব সুস্থ মা এবং সুস্থ শিশু, যা সুস্থ জাতি গঠনে অপরিহার্য। গর্ভবতী মায়ের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক দিক দিয়েও ভালো রাখতে হবে। এজন্য স্বামী এবং পরিবারের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। সামাজিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা পেছনে ফেলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে। কোনো ভারী কাজ না করানো, প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ, খিচুনি, রক্তস্বল্পতা রোধে সচেতন হতে হবে। এলক্ষ্যে পুরুষদের সম্পৃক্ততা একটি জরুরি বিষয়। শিশু জন্মের পর প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা, যেমন– নিয়ম অনুযায়ী টিকার ব্যবস্থা করা এবং মায়ের বুকের প্রথম দুধ (শালদুধ) খাওয়ানো নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর কৌশল দ্রুততর ও সহজ করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলকে প্রাধান্য দিতে হবে। ফকির, হাতুরে ডাক্তার এবং ওঝার শরণাপন্ন না হওয়া, নারী শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, পরিবহণ ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে। পরিবার-পরিকল্পনার প্রসার এবং দক্ষ প্রসবকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়বদ্ধতা রয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে সমাজের সব মানুষকে সচেতন হতে হবে। সচেতনতার মাধ্যমে আমরা মাতৃত্বকে যথাযথ সম্মান করতে এবং নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা নিশ্চিত করতে পারব। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজন সরকার এবং দেশের সকল জনগণের মিলিত প্রয়াস। এলক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারিভাবে যদি সমাজ ও পরিবারকে সচেতন করা যায়, তাহলে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস সার্থক হবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে– এই হোক নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের একান্ত কামনা।

লেখক: সিনিয়র সাব এডিটর, ডিএফপি

নিবন্ধ

৩১শে মে

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস

বাকী বিল্লাহ

তামাক একটি কৃষিজাত পণ্য, যা নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ। যার পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা কোনো অংশ বা অংশবিশেষ তামাক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর আদি উৎস আমেরিকা। বর্তমান বিশ্বে তামাক এক মৃত্যুদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তামাক এবং বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭ হাজারেরও বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। তার মধ্যে ৭০টি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্ষম। ধোঁয়াযুক্ত তামাকের মধ্যে সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, পাইপ ও হুক্কা প্রভৃতি অন্যতম। আর ধোঁয়াবিহীন তামাকের মধ্যে জর্দা, সাদাপাতা, গুল, নস্যি খৈনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন সকল তামাকই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তামাক ব্যবহারের কারণে দেশে প্রতিবছর ৫৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ নানাভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। প্রতিবছর সিগারেট ক্রয়ে দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১ ভাগ (১%) ব্যয় হয়। আর প্রতিবছর বিড়ি ক্রয়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) জিরো পয়েন্ট ৪ ভাগ (০.৪%) ব্যয় হয়। দেশে প্রতিবছর প্রায় ৮০০০ কোটি শলাকা সিগারেট এবং প্রায় ৫,০০০ কোটি শলাকা বিড়ি উৎপাদিত হয়।

পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর তামাক চাষের প্রভাব : খাদ্য উৎপাদনের জমিতে তামাক উৎপাদনের ফলে খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে। জমিতে দীর্ঘদিন তামাক চাষের কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। নদীর দুধারে তামাক চাষ করায় বর্ষাকালে রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানি দূষিত হচ্ছে। এক টন তামাক পাতা পোড়াতে ৫ টন জ্বালানি কাঠের দরকার। তামাক প্রক্রিয়াজাতে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। প্রতিবছর ৩১শে মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে দিবসটি পালিত হয় । আর তামাকের ব্যবহার কমাতে নতুন নতুন আইনও করা হয়েছে। তামাকের ক্ষতিকর দিক সিগারেটের মোড়কে (প্যাকেটে) তুলে ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের দেওয়া তথ্য মতে, এ বছর ৩১ মে, ২০১৭ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য 'The them For Tobacco– a threat to development' এর বাংলা অর্থ– *তামাক উন্নয়নের অন্তরায়*। তামাকমুক্ত দিবসটি সফল করার জন্য নানা আয়োজন করা হয়। প্রচারণা, জনসচেতনতা সৃষ্টি, দেশব্যাপী তামাকবিরোধী জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে তামাক সেবন ও উৎসাহ সৃষ্টির বিজ্ঞাপন, প্রচারণা আইন প্রণয়ন ও আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধানসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা : প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টি তামাক ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশে ১৫ বছরেরও বেশি বয়সের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪ কোটি ১৩ লাখের বেশি কোনো না কোনোভাবে তামাক ব্যবহার করছে। ২ কোটি ১২ লাখ পুরুষ ও ৭ লাখ মহিলা ধূমপান করছে। আর ১ কোটি ২৫ লাখ পুরুষ ও ১ কোটি ৩৪ লাখ মহিলা চর্বণযোগ্য তামাক ব্যবহার করছে। অপরদিকে কর্মক্ষেত্রে ১ কোটি ১৫ লাখের বেশি পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। তামাক ব্যবহারের কারণে মানুষের হৃদরোগ, মস্তিষ্কে স্ট্রোক, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), ফুসফুসের ক্যানসার, ফুসফুসে যক্ষ্মা, দীর্ঘস্থায়ী কাশি, হাঁপানি, মুখের স্বরতন্ত্রের বা শ্বাসনালির বা খাদ্যনালির ক্যানসার, বিবর্ণক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত, ক্ষতিগ্রস্ত মাড়ি, সময়ের আগে সন্তানের জন্ম নেওয়া, কম ওজনের সন্তানের জন্ম ও গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুও ঘটে থাকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের লোকজনের মধ্যে ধূমপানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ৩১শে মে ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

হিসেবে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে কৈশোর কিংবা তারুণ্যের অহেতুক খেয়ালিপণা, বন্ধুদের প্ররোচনা, আধুনিকতার ব্যর্থ চিন্তা, নিসঙ্গতা, অভিমান, হতাশা ও ব্যর্থতা। ধূমপান দিয়ে মূলত তামাক সেবন শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে গাঁজা চরশ, ফেনসিডিল, হেরোইন, পেথেডিনসহ আরো অনেক মাদক নেশা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নতুন করে ইয়াবা ট্যাবলেট নেশার জগৎকে খুবই আলোড়িত করেছে।

তামাক ক্ষেত

সিগারেটে আসক্ত বা ধূমপান করলে নানা মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। এর মধ্যে ফুসফুসে ক্যানসার, উচ্চ রক্তচাপ, গলব্লাডারে ক্যানসার, মুখে ক্যানসারসহ চুল পড়ে যাওয়া, ঠোঁট ও দাঁতের মাড়ি কালো হওয়া অন্যতম। আর সিগারেট থেকে আলকাতরা জাতীয় পদার্থ বের হয়ে গলা থেকে মুখমণ্ডল পর্যন্ত সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাই তামাককে না বলুন। আর এই তামাক থেকে একজন তরুণকে ফেরাতে পারে তার পরিবার। পিতাকে সিগারেট টানতে দেখে ছেলেও আসক্ত হয়। এইভাবে একটি পরিবার সিগারেটের নেশায় আসক্ত হয়।

দেশের প্রচলিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে,

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ। আইন অমান্য করলে অনধিক ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড।

আইনের বিধানমতে, পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণের মালিক তার নিজ অফিস, কর্মস্থল ধূমপান মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণের মালিক বা তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজার তার নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক প্লেস বা পরিবহণে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করবেন। অন্যথায় ১০০০ (এক হাজার টাকা) দণ্ডনীয় হবেন।

তামাকজাত দব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোনো দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান, কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন বা বিনামূল্যে নমুনা প্রদান নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে অনূর্ধ্ব ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ (৫০%) জায়গাজুড়ে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করতে হবে। আইন অমান্য করলে অনূর্ধ্ব ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১৮ বছর বয়সি কারো কাছে বা কারো দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হবে।

- তামাক মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়, তামাক বর্জন করুণ
- ধূমপানের কারণে কাশি থেকে শুরু করে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে
- তামাক ও ধোঁয়ায় ৭ হাজারেরও বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে

এই আইনের সকল অপরাধই আমলযোগ্য অপরাধ। এই আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে ওই দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাক ত্যাগ করলে একজন ধূমপায়ী নানাভাবে উপকৃত হবে। এরমধ্যে ২০ মিনিটের ব্যবধানে রক্তচাপ ও শিরার গতি স্বাভাবিক হবে। ৮ ঘণ্টা পর রক্তে অক্সিজেন মাত্রা স্বাভাবিক হবে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমতে থাকবে। ২৪ ঘণ্টা পর শরীর কার্বন মনোক্সাইড হতে মুক্ত হবে। ৪৮ ঘণ্টা পর রক্তে নিকোটিনের মাত্রা শূন্য হবে, মুখ ও শরীরের গন্ধ দূর হবে। ৭২ ঘণ্টা পর শ্বাসকষ্ট কিছুটা কমবে, কর্মক্ষমতা বাড়বে। ১ থেকে ৯ মাস পর স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারবে। ১ বছর পর হৃদরোগের সমস্যা ধূমপায়ীদের তুলনায় অর্ধেক হয়ে যাবে। ৫ বছর পর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ীদের সমমর্যাদায় নেমে যাবে। ১০ বছর পর ফুসফুসে ক্যানসারের হার ধূমপায়ীদের তুলনায় অর্ধেক হয়ে যাবে। অন্যান্য ক্যানসার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ১৫ বছর পর হৃদরোগ ও ক্যানসারের হার অধূমপায়ীদের মতো সমপর্যায়ে চলে আসবে। গর্ভবতী মায়েরা তামাক পরিত্যাগ করলে স্বল্প ওজনসম্পন্ন শিশু জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। তামাক পরিত্যাগ করলে যেসব সমস্যা হয় তা সাধারণত ধূমপান ছাড়ার ১ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে প্রত্যাহারজনিত সকল উপসর্গ চলে যায়। এইভাবে ধূমপান ত্যাগকারীরা নানাভাবে উপকৃত হবে। যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

দেশে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমাতে সরকারের উদ্যোগকে সফল করতে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে সকল মিডিয়া সিগারেটসহ তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ রেখেছে। এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। তবে মিডিয়ায় প্রচারিত নাটক, সিনেমাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও সিগারেট, জর্দা ইত্যাদি সেবন করার দৃশ্য বর্জন করা জরুরি। বিষয়টি সকলের ভেবে দেখা দরকার।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

মোছা. মোবাস্বেরা কাদেরী

দুস্থ ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদানের জন্য 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪' অনুসারে গঠিত সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বর্তমান সরকার দুস্থ, অসুস্থ, দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত সাংবাদিক এবং তার পরিবারের মাঝে অর্থ সাহায্য প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমান সরকারের তথ্যমন্ত্রী, তথ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সমন্বয়ে এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়ে থাকে। তথ্যমন্ত্রী পদাধিকার বলে এই ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং তথ্য সচিব এই বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন।

ট্রাস্টের মূল কাজ

ট্রাস্টের মূল কাজ দুস্থ ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের কল্যাণ করা। সাংবাদিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই ট্রাস্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এইসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পেশাগত কাজ করতে অক্ষম ও অসমর্থ সাংবাদিককে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং অসুস্থ সাংবাদিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই ট্রাস্ট সাংবাদিকদের সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদান করে এবং সাংবাদিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা দানের জন্য এককালীন মঞ্জুরি, বৃত্তি প্রদান করে থাকে। দুর্ঘটনায় বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় কোনো সাংবাদিক গুরুতর আহত হলে বা নিহত হলে সাংবাদিক পরিবারকে সাহায্য প্রদান করা হয়। এই ট্রাস্ট তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করে থাকে। তাছাড়া অবসরপ্রাপ্ত প্রখ্যাত সাংবাদিক অথবা খ্যাতিমান প্রয়াত সাংবাদিকদের অসচ্ছল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা দান ও তাদের কল্যাণের জন্য এই ট্রাস্ট কাজ করে থাকে। সাংবাদিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে এবং এই আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো কাজ সম্পাদন করে।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতায় দুস্থ, অসুস্থ, দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত সাংবাদিকদের পরিবারের মাঝে বিগত কয়েক বছরে বিতরণকৃত অনুদানের বিবরণ:

অর্থবছর	অনুদানভোগীর সংখ্যা	মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
২০১১-২০১২	৬১ জন	৫০ লক্ষ	সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/ অনুদান নীতিমালা, ২০১২-এর আওতায় বিতরণকৃত।
২০১২-২০১৩	১৮৫ জন	১ কোটি	ঐ
২০১৩-২০১৪	১৯৬ জন	১ কোটি ১০ লক্ষ	ঐ
২০১৪-২০১৫	১৮১ জন	১ কোটি ২০ লক্ষ	ঐ
২০১৫-২০১৬	১৯৬ জন	১ কোটি ৪০ লক্ষ	সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতায়
মোট= ৮১৯ জন		৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতায় অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সাংবাদিক বা আবেদনকারী অনুদান পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ইউনিয়ন বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রেসক্লাব-এর সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশসহ আবেদন দাখিল করবেন। ঢাকা ছাড়া সকল জেলার আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা কমিটির সুপারিশ লাগবে। ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। জেলা কমিটি জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত সব আবেদনপত্র পর্যালোচনা করে অনুদান পাওয়ার যোগ্য আবেদনপত্র থাকলে তা নির্বাচন করে সুপারিশসহ ঢাকায় ট্রাস্টের কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা কমিটি গঠিত হবে। জেলা কমিটিতে অন্যান্যরা হলেন– জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন বা প্রেসক্লাব-এর সভাপতি দ্বারা মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং জেলা তথ্য কর্মকর্তা জেলা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে থাকবেন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৬ অনুযায়ী, মৃত সাংবাদিকের পরিবারের একাধিক সদস্য থাকলে অনুদানে প্রদেয় অর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্যকে প্রদান করা হবে। ক্ষমতাপত্রটি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ইউনিয়ন বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রেসক্লাব-এর সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে। বিধিমালা অনুসারে সাংবাদিকের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত ক্রম অনুসরণ করতে হবে। যথা:

১. মৃত সাংবাদিকের ক্ষেত্রে সেই সাংবাদিকের স্ত্রী বা স্বামী, যদি তিনি পুনরায় বিয়ে না করে থাকেন;
২. পুত্র সন্তান;
৩. হিন্দু সাংবাদিকের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র;
৪. কন্যা সন্তান;
৫. সাংবাদিকের সাথে একত্রে বসবাসরত বা তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পিতা;
৬. সাংবাদিকের সাথে একত্রে বসবাসরত বা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল মাতা;
৭. সাংবাদিকের সাথে একত্রে বসবাসরত বা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নাবালক ভাই;
৮. সাংবাদিকের সাথে একত্রে বসবাসরত বা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা বোন;
৯. সাংবাদিকের সাথে একত্রে বসবাসরত বা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধী ভাই;
১০. সাংবাদিকের সাথে একত্রে বসবাসরত বা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধী বোন;

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৬-এর ধারা ৭ অনুযায়ী বোর্ড অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রাপ্ত আবেদনগুলো পর্যালোচনা করে অনুদান পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা করলে আবেদনপত্র সুপারিশসহ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবে। বোর্ড সুপারিশকৃত আবেদন বিবেচনা করে অনুদান পাওয়ার যোগ্য মনে করলে অনুদানের পরিমাণসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অনুদান মঞ্জুরির আদেশ জারি করবেন। অনুদান মঞ্জুরের পর মঞ্জুরিকৃত অর্থ গ্রহণের পূর্বে আবেদনকারীর মৃত্যু হলে বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে মঞ্জুরিকৃত অর্থ তার পরিবারের সদস্যকে প্রদান করা যাবে।

তাছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বিশেষ অনুদান প্রদান করতে পারবেন। এই বিশেষ পরিস্থিতি হতে পারে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা, দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদান। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা এবং ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করতে পারবেন।

বর্তমান সরকার এভাবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে দুস্থ, অসচ্ছল ও অসহায় সাংবাদিক ও তার পরিবারবর্গকে আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে আসছে। সাংবাদিকদের প্রতি সরকারের এই সহানুভূতিশীল অবস্থান গণতন্ত্র ও উন্নয়নের গতিধারাকে আরো মজবুত করবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

প্রথম নারী প্রধান তথ্য অফিসার

নারীর ক্ষমতায়নে মাইলফলক

নাসরীন জাহান লিপি

সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জনগণ যদি না জানে, তবে সেই উন্নয়নের মূল্যায়ন পুরোটা হয় না। সরকার বঞ্চিত হয় সাফল্যের প্রশংসা পেতে, ব্যর্থ হয় জনগণের আস্থা অর্জন করতে এবং হারিয়ে ফেলে উন্নয়ন সম্বন্ধে জনগণের পরামর্শ- মতামত গ্রহণের সুযোগ। এমডিজি সাফল্যে বাংলাদেশ বিশ্বকে বিস্মিত করেছে, যার মূল চাবিকাঠি ছিল জনগণ। প্রতিটি সরকারি কর্মসূচি জনগণ গ্রহণ করেছে, সচেতন হয়েছে, নিজেদের অংশগ্রহণকে সুদৃঢ় করেছে।

সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্য জনগণের মাঝে বিতরণের জন্য বিসিএস তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয়। গণযোগাযোগ প্রয়োজন হলে প্রতিটি জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার মতো মেকানিজম সরকারের হাতে আছে, তথ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এই মেকানিজম কাজ করছে। আর তাই সন্তানকে ছয় মাস বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয় তথ্য তো বটেই, আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়ের মতো জটিল বিষয়ও সহজ ও কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতিতে জনগণকে জানিয়ে দেওয়ার কাজটি পেশাদার তথ্য কর্মকর্তার সাহায্যেই সফলতার সাথে সম্ভব হয়েছে। গণমাধ্যমে কর্মীদের সংবাদ তুলে আনা ও প্রকাশের সহযোগিতার পাশাপাশি দায়বদ্ধতার জায়গায় থেকে তথ্য কর্মকর্তারা উঠান বৈঠক, মাঠ পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে নটা-পাঁচটার সরকারি কাজের সময়সীমাকে ছাপিয়ে জনগণের তথ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখছেন। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত তথ্য কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন সংবাদ গণমাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রদান করছেন।

আসলে তথ্য প্রাপ্তির পয়েন্টে যে জনগণ, সেখানে নারীর উপস্থিতিও একটি বিষয়, কেননা দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। নারীর অধিকার অর্জিত হচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। নারী তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে লড়ছে, সরকারি তথ্য এবং বেসরকারি গণমাধ্যমে অসংখ্য নারী কাজ করছেন অসাধারণ দক্ষতার সাথে। নারীর যোগাযোগ-সম্পর্কের স্বীকৃতি তথা গণমাধ্যমে ও তথ্য সেবা প্রদান কর্মকর্তা হিসেবে নারীর দক্ষতার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি মিলেছে এই প্রথম। বাংলাদেশ সরকার এই প্রথম প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে একজন নারী তথ্য কর্মকর্তাকে বেছে নিয়েছে।

অভিনন্দন প্রথম নারী প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহারকে। ১৯৮৪ ব্যাচের এই কর্মকর্তা তথ্য ক্যাডারের অন্যতম যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। নারী হিসেবে নয়, তিনি তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণেই প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এর আগে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত দপ্তরগুলোতে তিনি যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে তথ্য প্রচারের সবচেয়ে বড়ো দফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের আটষট্টিটি তথ্য অফিসের পরিচালনা করছিলেন মহাপরিচালক হিসেবে। বর্তমান বাংলাদেশ নারী পরিচয়কে খাটো করে দেখার সময় পার করে এসেছে, তার প্রমাণ আরো একবার পাওয়া গেল। এর জন্য বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। কেননা, প্রশাসনে নারীর মেধার মূল্যায়ন তিনিই প্রথম করেছিলেন। পুরনো দিনগুলো তো তেমনই বলে।

উনিশশ সাতানব্বই সালে জাকিয়া আক্তার চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়োগ দিয়েছিলেন সচিব হিসেবে। তিনিই শুরু করেছিলেন এক নতুন যুগের। কেননা, এর আগে নারী কখনো প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসীন হয়ে নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারেন বলে কেউ ভাবেননি। যুগের পর যুগ একই বৃত্তে ভাবনাকে আটকে রেখে চলতে থাকে সমাজ– তখন রাজা রামমোহন রায় ও বেগম রোকেয়ার মতো সমাজ বদলে দেওয়া শক্তিশালী মানুষগুলো চোখে আঙুল দিয়ে সমাজের দৃষ্টিকে বৃত্তের বাইরে এনে ফেলেন। জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। তিনি সত্যিই পরিবর্তনের প্রতিনিধি। দেশটাকে পরিবর্তন করে দিতে কাজ করছেন। তিনি নারী পরিচয়ের বাইরে এসে দক্ষতা ও যোগ্যতাকে বিবেচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেন। বাংলাদেশ পেয়ে গেছে নারী জেলা প্রশাসক, নারী এসপি, নারী ইউএনও, নারী ওসি, নারী জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী উপাচার্য, নারী সচিব এমনকি নারী সিনিয়র সচিব হিসেবেও আছেন। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ সারা বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। এখন রাস্তায় নেমে ভোট চাইছেন জনপ্রতিনিধি হতে ইচ্ছুক কোনো নারী। সংসদের চালিকাশক্তি যোগ্যতার বলে নারী স্পিকার হতে দেখে আমরা প্রশ্ন তুলি না। সেরকমভাবেই নারী ট্রাফিক পুলিশ গনগনে রোদে পথের বিশৃঙ্খলতা সামলাচ্ছেন দেখে ভাবি না, মেয়েরা কেন এই পেশায়? নারী উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, যার সুফল উঠে আসছে সমাজের সব ক্ষেত্রে। সুযোগ পেলেই সদ্ব্যবহার করছেন বাংলাদেশের নারীরা। প্রশাসনের কথাই ধরি, চৌত্রিশতম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারসহ আটটি ক্যাডারেই নির্বাচিত হয়েছেন নারী।

এখনো বহুদূর যেতে হবে কিন্তু। প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ এখনো খুবই কম। এর অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। সচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের বিবেচনা করার হার এখনো কম। পদায়নের অসমতা প্রকারভেদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজটি কঠিন করে তুলবে, যেখানে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে নারী-পুরুষের অসমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সচিব পর্যায়ে অবসরে গেছেন, যাচ্ছেন বা যাবেন, এমন কর্মকর্তাদের শূন্যস্থান পূরণে নারী সচিবের নিয়োগের হার আরো বেশি হারে বৃদ্ধি করার দাবিটি এখন সময়ের প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে যাওয়া বাস্তবতা মাত্র।

সামগ্রিক নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি অফিসে নানান কর্মসূচি গ্রহণের আদেশ আছে। নারীর মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে সিডও'র ধারাগুলো বাস্তবায়নে জোরদার কাজ চলছে। এর ফলে নারীদের অন্যান্য কর্মক্ষেত্র তো বটেই, সরকারের তথ্য সেবা প্রদানে দায়িত্ববান নারী তথ্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বেসরকারি গণমাধ্যমে কর্মরত নারীদের যোগ্যতা প্রকাশের জায়গা আরো সুসংহত হবে।

দেশের প্রধান তথ্য অফিসার যেহেতু নারী, সেহেতু গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের ইচ্ছার জায়গাতে ভূমিকা রাখার সুযোগ পেলে তিনি যে সার্থকতার সাথেই নারীর যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ রাখবেন, নারীর মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে কাজ করবেন, এ ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

লেখক: সম্পাদক, নবারুণ, ডিএফপি

একটি সাদা পাঞ্জাবি

শামস সাঈদ

শেষ তেরোদিন আগে বাড়ি ছেড়েছেন বাবা। বাসা বেঁধেছেন হাসপাতালের ছোট্ট রুমে। আমাদের বাড়িটা কখনো ডোবা পুকুর ছিল না। এখন নিতান্তই জলশূন্য মরা নদী। হাসপাতালের ছোট্ট রুমটা ভরে উঠেছে মানুষের গন্ধে। কেউ না কেউ লেগেই আছে বাবার খাটের পাশে। তীর্থের কাকের মতো মা বসে আছেন বাবার মুখের কাছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে। বাবাকে রেখে দুপা দূরে সরতে চাচ্ছেন না। কখনো-সখনো জোর করে বাসায় পাঠাচ্ছি। গোসল করতে কিংবা একটু বিশ্রাম নিতে।

আগেও অনেকবার হাসপাতালে এসেছেন বাবা। ভর্তি হয়েছেন। অনেকদিন থেকেছেন। লড়াই করেছেন শত্রুর সঙ্গে। যে শত্রু চার বছর আগে বাবার শরীরে বাসা বেঁধেছে। রক্তমাংসের নরম শরীরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কখনো বাবাকে দুর্বল মনে হয়নি। এবার বাবাকে দুর্বল মনে হচ্ছে। ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছেন মধুপুরের দিকে। তবে আত্মসমর্পণ করেননি মনোবলের কাছে।

বাবার শিয়রে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারছি না। কষ্ট হচ্ছে। দূর থেকে দেখছি বাবাকে। দিন দিন বাবা কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। একটা হাড্ডিসার কঙ্কালের মতো। অচেনা লাগছে। খানিক আগে আমি সূর্যকে ডুবতে দেখেছি। আর একটা সূর্য ডুবতে বসেছে হাসপাতালের বেডে। যে আমার বাবা।

বাস্তবতার বাইরে গিয়ে মানুষ অমর হতে পারে না। দীর্ঘ জীবনও লাভ করতে পারে না। কিন্ত মা সেসব বিশ্বাস করছেন না। কোনোভাবেই মানতে পারছেন না, এই অসুখ বাবার শেষ যাত্রার রথ। আমিও মাকে বলতে পারিনি। এসব বোঝার পরেও একটা অভিনয় করে যাচ্ছি। মিথ্যা অভিনয়। যাতে মা বুঝতে পারেন ভালো হয়ে বাবা বাড়ি ফিরবেন। নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছি। খানিক পরে গিয়ে বাবার পাশে বসলাম। বাবার মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। বাবার মুখে শোনা তাঁর ছোটোবেলার গল্প শোনাই। এসব গল্প শুনে বাবা মৃদু হাসেন। কী জন্য হাসেন সেটাও জানি। হয়ত ভাবছেন আমি তাঁর মন ভোলাচ্ছি। কয়েক সেকেন্ড পরে সেই মিথ্যে হাসিটুকুও হারিয়ে যায়। লিভারের তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে গেছেন বাবা। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কষ্টটাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। ব্যথা এতটাই তীব্র যে, আড়াল করতে পারছেন না। অস্ফুট একটা শব্দে বেরিয়ে আসে 'মা'। মা শব্দটা বাবার কষ্টের প্রতিধ্বনি। সেই কষ্টটা আমার হৃদয়ে হাতুড়ি পেটা করছে। এটাই হচ্ছে বাবা-ছেলের সম্পর্ক। আমার ভেতরের যন্ত্রণাটা মাকে বুঝতে দিচ্ছি না। চোখের জল বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছি। উপচে পড়ে পড়ে তবু পড়তে দিচ্ছি না। মা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

মাকে আজ বাসায় পাঠিয়েছিলাম। জোর করে। তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে। গোসল সেরে বিশ্রাম নিয়ে আস। মা যেতে চাননি। বললেন, তোর বাবাকে রেখে আমি কোথাও যাব না। তখনই বাবা বললেন, বাতাসি মাছ চচ্চড়ি আর বালাম চালের ভাত খাবেন। মাকে বললেন, তোমার হাতের রান্না খাইনি অনেকদিন। আর একটা হেরিকেন নিয়ে আসবা।

মা বাসায় গেলেন। আমি অবাক হলাম। বিস্ময়ের চোখে দেখছি বাবাকে। ভাবছি হেরিকেন দিয়ে বাবা কী করবেন? আরো বেশি অবাক হলাম মা কোনো প্রশ্ন করেননি। বাবার মাথার কাছে বসে আছি। দেখছি বাবাকে। হাত বুলাচ্ছি কপালে। রুমের ভেতর কেউ নেই। হঠাৎ বাবা আমার হাত ধরলেন। শক্ত করে। বাবার শরীরটা দিন দিন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বাবার চোখ আর আমার চোখ জিরো বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। আমার শরীরের ভেতর একটা শিহরণ উঠেছে। বাবা এভাবে ধরলেন কেন ? মনে হচ্ছে আমি ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছি। কিংবা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি। না হয় সমুদ্রের তীরে। কিংবা জ্বলন্ত কোনো আগ্নেয়গিরির পাশে। যে-কোনো সময় পড়ে যাব। হাত ধরে বাবা আমাকে রক্ষা করছেন। চল্লিশ বছর এই একটি হাত আমাকে যত্ন করে আগলে রেখেছে। স্থির দৃষ্টিতে আমি দেখছি সেই হাতটাকে। বাবা একমুহূর্ত আমার দিক থেকে চোখ সরাতে পারলেন না। উঠে বসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারছেন না। আমি তুলে দিতে চাইলাম। হাত দিয়ে বললেন, না, উঠবেন না। আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন। এরকম একটা সময় হয়ত খুঁজেছিলেন। কখন আমাকে একা পাবেন। বাবার মাথাটা আমার কোলের মধ্যে। আমার কাছে বাবা এখন ছোট্ট শিশু। যে শিশুর বাবা আমি। নিচু স্বরে বললেন, তুমি কী খুব ক্লান্ত?

আমি চুপ করে আছি। কোনো চিন্তা, ক্লান্তি বাবাকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। বাবার চোখে কী আমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

একটু দম নিয়ে বললেন, মানিক, দীর্ঘদিন আমি লড়াই করেছি। কখনো হারিনি। একটা সময় হারতেই হবে। সেটা আমি জানতাম। সেই সময়টা এবার এসেছে। আমি হেরে যাচ্ছি মানিক। তাতে কোনো আফসোস নেই। আমি আত্মসমর্পণ করিনি কাপুরুষের মতো। লড়াই করেছি বীরের মতো, তারপর হেরেছি। এ পরাজয়ের মধ্যেও বিজয়ের স্বাদ পাচ্ছি। এসব এখন থাক। একটা কথা শোন, তোকে বাবা হয়ে উঠতে হবে।

বাবার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। বাবা এ কী বলছেন। আমাকে বাবা হয়ে উঠতে হবে। ক্রমশই আমি দুর্বল হচ্ছি। দেখছি বাবা নামের এক পুরুষের ছবি। যে আমাকে বাবা হয়ে উঠতে বলছেন। এই মানুষটা আমার সামনে থেকে সরে যাবেন। তখন সবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। আমি কী পারব, সব সামলে নিতে? সবার দায়িত্ব নিতে? বাবার মতো হয়ে উঠতে?

বাবা বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ? তাহলে শোনো, তোমার বয়স এখন চল্লিশ। আমার যখন বয়স সাত, তখন আমি বাবা হয়ে উঠেছিলাম। কার্তিক মাসের কোনো এক সন্ধ্যায়। বাবার মুখের কাছে বসে আছেন মা। তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নামছে। বাবার কী হয়েছে আমি জানি না। তবে বাবা কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে আছেন। বাবার পাশে বসে কাঁদছি আমি। সেটা মায়ের কান্না দেখে। সে রাতেই আমাকে আর মাকে রেখে পশ্চিমের ভিটেয় চলে গেলেন বাবা। বুঝতে পারছি বাবা আর আসবেন না। অভিমান করে চলে গেছেন। এখন বুঝে-শুনে কাঁদছি। মাও কাঁদছেন। হঠাৎ আমার মনে হলো আমি আর মা– আমরা দুজন। মা কাঁদছেন। আমিও কাঁদছি। তাহলে মায়ের চোখের জল মোছাবে কে? আমি চোখ মুছে মায়ের সামনে দাঁড়ালাম। বললাম, কাঁদছ কেন মা? বাবা নেই সে জন্য? কেঁদো না। আমি তো আছি। মায়ের কান্না থেমে গেল। মা পাথরের মতো জমে গেছেন। তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। হয়ত ভাবছেন তার সাত বছরের খোকা সাতাশ বছরের যুবকের মতো কথা বলছে। বাবার মতো হয়ে উঠেছে। সেদিনের পর থেকে আমি সংগ্রাম করেছি, মায়ের চোখের জল মোছাতে। মায়ের জীবনের শূন্যতা দূর করতে। সব পেরেছি। শুধু মাকে হাসাতে পারিনি। মা কোনোদিন হাসেননি। সেদিন বুঝেছিলাম স্বামীর শূন্যস্থান সন্তান পূর্ণ করতে পারে না। আমি শুনছিলাম বাবার বাবা হয়ে ওঠার গল্প। দেখলাম বাবার চোখ জলে ভরে উঠছে। সে জল মুছে বললেন, তবু তোমাকে বাবা হয়ে উঠতে হবে। সবাইকে আগলে রাখতে হবে। মাকে, ছোটো ভাইকে, বোনকে। পারবে না?

বাবার গল্প শুনে আমি স্থির হয়ে গেলাম। এই গল্প বলে মায়ের দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন বাবা। বাবা হতে বলছেন। আমি কী পারব মাকে আগলে রাখতে? মায়ের জীবনে বাবার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে? আমি কী পারব সংসারের হাল ধরতে? আমি কী পারব সবাইকে

আগলে রাখতে? এ চিন্তাগুলো এলোমেলো একটা ভাবনা সৃষ্টি করে দেয় আমার মনে। হারিয়ে যাই বাবাহীন জীবনে। যে জীবনের কোনো প্রান্ত খুঁজে পাচ্ছি না।

বাবা বললেন, মানিক, আর একটা কাজ করতে হবে। এবার আমি বাবার হাত ধরলাম। বললাম, কী করতে হবে বলো। তোমার জন্য সব করতে পারি। বাবা একটা ম্লান হাসি দিলেন। বললেন, এটাই তো বাবা-ছেলের সম্পর্ক।

আমি চুপ করে আছি। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বাবা বললেন, আমাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমি মায়ের কাছে যাব। বাবা আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের কোন বেয়ে জল নামছে। আমার চোখও জলে ভরে ওঠে। বাবার চোখের জল মুছিয়ে অন্যদিকে তাকালাম।

বাবা বললেন, জানো মানিক, মা আমাকে রেখে কোনোদিন কোথাও যাননি। কত গল্প বলতেন। মাথায় বিলি কেটে ঘুম পাড়াতেন। বলতেন, তুই হইলি আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। সে জন্যই তোর নাম রেখেছিলাম মানিক।

আমি শুনছি বাবার কথা। যে বাবা আমাকে হাত ধরে এখানে-সেখানে নিয়ে যেতেন। সেই বাবা আজ তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে বলছেন। হঠাৎ আমি বড়ো হয়ে গেলাম। কী ভেবেই যেন বললাম, চিন্তা করো না। পঁচাত্তর বছর আগে তুমি যে মধুপুর থেকে উঠে এসেছ, সেই মধুপুরে তোমাকে পৌঁছে দেব। পশ্চিমের ভিটেয়। বেল গাছের নিচে। তোমার মায়ের কাছে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। মা এসে সামনে দাঁড়ালেন। আমাকে একটু দূরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাবা কী বললেন মানিক?

আমি বললাম, গল্প। মা বিশ্বাস করলেন না। আমিও জানতাম মা বিশ্বাস করবেন না। বললাম, হ্যাঁ, গল্প বলেছেন। বাবা হওয়ার গল্প।

মা আর কিছু বললেন না। বাতাসি মাছের চচ্চড়ি দিয়ে বাবার মুখে বালাম চালের ভাত তুলে দিলেন। বাবা বললেন, আজ মনে হয় তুমি রান্না করনি।

অবাক চোখে মা বললেন, আমি রেঁধেছি।

তাহলে পঁয়তাল্লিশ বছর তোমার রান্না খাওয়ার পরেও আজ ভুলে গেছি। হয়ত তাই হবে। সবকিছুই তো আজকাল ভুলে যাচ্ছি। তবে তোমাকে কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি।

মায়ের চোখ থেকে কষ্টের জল নামছে। বাবা খুব স্বপ্ন নিয়ে খেতে শুরু করেছিলেন। এক লোকমা খেয়ে সরিয়ে দিলেন। আর খাবেন না। খেতে পারছেন না। আমি দেখছি বাবাকে। প্রতিদিন একটু একটু করে বাবা মধুপুরের দিকে আগাচ্ছেন। পঁচাত্তর বছরে গড়ে ওঠা শরীরটা হারিয়ে যাচ্ছে। আমার ভয় বাড়ছে। দায়িত্ব বাড়ছে। মাথায় চাপ বাড়ছে।

বাবা বললেন, সবগুলো লাইট বন্ধ করে দাও। হেরিকেনটা জ্বালিয়ে নিভু নিভু করে আমার মাথার কাছে রাখ। মা আসবেন। আমাকে দেখতে। আমি মায়ের সাথে চলে যাব।

আমি বললাম, বাবা কী সব অদ্ভুত কথা বলছ তুমি। মানুষ দেখলে হাসবে। বলবে, কারেন্ট অফ করে হেরিকেন জ্বালাচ্ছে।

আমাকে থামিয়ে দিলেন মা। তাঁর কাছে বাবার ইচ্ছেগুলো বড়ো। মা হেরিকেন জ্বালিয়ে বাবার শিয়রে রাখলেন।

বাবা বললেন, এসব আলো মায়ের পছন্দ না। হেরিকেনের আলোতে আমি বড়ো হয়েছি। আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। বাবার মৃত্যুর সময় মা বসেছিলেন হেরিকেন জ্বালিয়ে। ছোটোবেলায় আমার অসুখ হলে মা হেরিকেন জ্বালিয়ে নিভু নিভু করে মাথার কাছে রাখতেন। সারারাত আমার মাথায় হাত বুলাতেন। হাজারো গল্প বলতেন। সকালে আমি ভালো হয়ে যেতাম। ব্যাগ নিয়ে স্কুলে ছুটতাম। মা দেখতেন আমাকে। আঁচলে চোখ মুছতেন। আমার মাঝে বাবাকে খুঁজতেন। আমি নাকি ঠিক বাবার মতো হয়েছি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি হাঁটছি, উদ্দেশ্যহীনভাবে। বাড়ি ফেরার কথা আমার মনে নেই। হঠাৎ মনে হলো ফোন করতে হবে মধুপুরে। ফোনটা হাতে নিই। ফোন করতে পারি না। বড়ো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ফোন করাটা। উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে বাসায় ফিরলাম। ভাবলাম এবার ফোনটা করতে হবে। ফোন করলাম মধুপুর। রহমান কাকা বললেন, মানিক ওসব নিয়ে তোর চিন্তা করা লাগবে না। বড়ো ভাইজানের কয়বোরের সব ব্যবস্থা করে রাখছি। পশ্চিমের ভিডা পরিষ্কার করছি। চাচি আম্মার কয়বোরের পাশের জাগাডাও দেইখা রাখছি।

আমি নিস্তব্ধ হয়ে যাই। চোখ থেকে জল ঝরে। এ আমি কী করছি।

বাবার মুখে প্রতিদিন তাঁর মায়ের কথা শুনতাম। একদিনও বাদ যেত না। সেই মাকে মধুপুর রেখে বাবা থাকতে পেরেছেন। এই শহরের ব্যস্ততায় হারিয়ে গেছেন। আমিও পারব বাবাকে ভুলে থাকতে। বাবার মতো হয়ে উঠতে। মানুষ এরকমই হয় বুঝি। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো আমার কোনো সাদা পাঞ্জাবি নেই। সাদা জিনিস আমার পছন্দ না। বাবারও পছন্দ ছিল না। কখনো ভাবিনি জীবনের এই রঙিন পাঠের ভেতর একটা সাদা-কালো অধ্যায় এসে হাজির হবে। এখন মনে হচ্ছে একটা সাদা পাঞ্জাবি কিনতে হবে। মনে পড়ল ছোটোবেলার কথা। মা, আমি, পিউল মধুপুর থাকি। দাদির কাছে। ঈদের আগের দিন সন্ধ্যায় বাবা বাড়ি ফিরলেন। সবার জন্য নতুন কাপড় নিয়েছেন। আমার জন্য একটা পাঞ্জাবি নিয়েছিলেন। সেটা তখন দেখাননি। দেখেছিলাম পরদিন সকালে। পৌষের সকালে আমাকে নিয়ে বাবা গোলবানুর পদ্মপুকুরে গেলেন। বরফ জলে গোসল করালেন। কসকো সাবান দিয়ে। বাবার হাত ফসকে সাবানখানা ডুব মারল পুকুরের জলে। বাবা সেদিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন। সাবানখানাকে ডুবে যেতে দেখলেন। আমাকে গোসল করিয়ে কূলে উঠে এলেন। শরীরটা মুছিয়ে চাদর প্যাঁচিয়ে দিলেন। তারপরও আমি কাঁপছি। থরথর করে। ঠোঁটে ঠোঁট মিলে যাচ্ছে। দেখছি বাবাকে। পুকুরের মাঝে টুপ করে বাবা ডুব দিলেন। এখন বাবাকে দেখছি না। ডুবে যাওয়া সেই সাবান নিয়ে ফুচকি মেরে উঠলেন বাবা। আমি হাতে তালি দিচ্ছিলাম।

গোসল সেরে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বাবা। তাঁর উষ্ণতায় সব শীত দূর হয়ে গেল। বাবার কোলে চড়ে বাড়ি ফিরলাম। ব্যাগ থেকে পাঞ্জাবি বের করলেন বাবা। লাল পাঞ্জাবি। আমাকে একটা পরিয়ে দিলেন। নিজেও একটা পরলেন। বাবার হাত ধরে মুনশি বাড়ির ঈদগাহে নামাজ পড়তে গেলাম। আমি দেখছিলাম বাবাকে, আবার আমাকে। বাবা লাল। আমিও লাল। ছেলে যে রঙের কাপড় পরে বাবাও বুঝি সে রঙের কাপড় পরে। সেদিন এটাই আমি বুঝেছিলাম। আজ আমি বাবা। বাবা আমার ছেলে। বাবা সাদা কাপড় পরবেন। আমারও সাদা পাঞ্জাবি পরতে হবে।

বাবার কথা মনে পড়ায় হৃদয়টা ভেঙেচুরে মুচড়ে উঠছে। কী করব? আমার সামনে অনেক কাজ। বাবাকে তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। একটা সাদা পাঞ্জাবি কিনতে হবে। সবার দায়িত্ব নিতে হবে। বাবা হয়ে উঠতে হবে। মনে হলো সাদা পাঞ্জাবিটা জরুরি। যে-কোনো সময় বাবা মধুপুরে রওয়ানা হতে পারেন। পাঞ্জাবিটা কখন কিনব? ভাবলাম এখনই যাব। একটা সাদা পাঞ্জাবি কিনে বাসায় ফিরব। ঘুরে দাঁড়াতেই ফোনটা বেজে উঠল। মায়ের ফোন। দুশ্চিন্তা আর ভয়ে একমুহূর্ত স্থির হয়ে গেলাম। বাবার কিছু হয়নি তো? ফোন ধরতেই মায়ের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদের একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আমার হৃদয়ে। মানিক তোর বাবা চলে গেছেন।

হোসেন্দি : হে পিতৃভূমি

মনজুরুর রহমান

এ গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই; আমি–
একবিংশ শতাব্দীর এক গৃহহীন পর্যটক।
পিতা-প্রপিতামহের ভিটি ছুঁয়ে ছেঁড়া শেকড় সন্ধানে
এলেক্স হেলির মতো বার বার ফিরে আসি–
তোমার সান্নিধ্যে; হে পিতৃভূমি।

এ বড়ো পবিত্র মাটি!
নাড়ি পোতা যার–
অনন্ত শরীরে।
আমার জন্মের ক্ষণে–
দাদাজানের ললিত কণ্ঠের আজান
ভেঙেছে তাবৎ মৌন কোনো এক
কুয়াশা চাদরে ঢাকা শীত সকালের।

সারি সারি স্বজনের ধূসর স্মৃতিরা
এইখানে পাণ্ডুলিপি মেলে ধরে;
টুপটাপ শিশিরের মতন কান্না
অবিরাম ঝরে পড়ে–
ক্ষেতে ও খামারে।
প্রবীণ ব্রহ্মপুত্রের জল ছোঁয়া সবুজ বাতাস–
দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে খেলা করে–
খেলা করে শুধু।
যেখানেই থাকি স্বপ্ন-জাগরণে দেখি–
সুবাসিত ধানের মঞ্জুরি।

সব কাজ ফেলে দিয়ে–
যখনই ফিরে আসি জন্মভিটায়
মৃগনাভির মতন শৈশব গন্ধ ছড়ায়;
পলন মৃত্তিকা লগ্ন–
এই আমি হয়ে উঠি–

গভীরে প্রোথিত এক বৃক্ষমানব!

মন থেকে মরল না ভালোবাসা

দেলোয়ার হোসেন

তোমাকে দেখব দুচোখ ভরে
সবকটি জানালা রাখব খুলে,
যখন ক্লান্ত দুপুর দেবদারুর লম্বা
ছায়ার সাথে নামবে আঙিনার ঘাসে।
তুমি আসবে, কেউ জানবে না সে খবর।
দোতলার ঘরটা সাজিয়েছি নতুন করে
তুমি আসবে বলে– আমি দু'চোখ ভরে
দেখব তোমার চোখে রাখিনি আমার চোখ
যদি লজ্জা ভেঙে যায়।
ভালো করে দেখাও হয়নি মুখ
যদি পুরনো হয়ে যাও,
চিরকালের মতো পাব– সেই আশায়।
তুমি এলে না, কথা দিয়ে রাখলে না কথা।
সাজানো ঘর তেমনি রয়েছে পড়ে।
তারপর কত প্রহর, মাস, বছরের পর বছর
হলো গত। বর্ষা-খরায় সেই সোনামুখ আজ
পরিত্যক্ত খেয়াঘাট। তুমি স্বপ্নের মধ্যে আস-যাও।
আমি কেমন বোকা দেখ! মিছেমিছি স্বপ্ন সাজাই।
কী যে সুখ, তা শুধু মনই জানে। মন থেকে
মরল না ভালোবাসা–জীবনে মরণের দ্বারপ্রান্তে।

নীরব দ্রোহের অন্তঃক্ষরণ

মাজেদুল হক

বজ্রপাতের শব্দের মতোই শুনতে পাই
মনের করুণ আর্তনাদ।
নিজ সত্তাকেও হারিয়ে ফেলি অমানিশার ঘন কালো
রাত্রির নির্জনতায়...

প্রলম্বিত কষ্টের তাড়নায় অস্থির হয়ে
ভেজা টলমলে দু'চোখ বুজে ব্যর্থ প্রশান্তির নিশ্বাসে
অক্সিজেন নিতে থাকি।
নিশ্বাসের ভেতর জিইয়ে থাকা বিষাক্ত ধাতুতে আগুন জ্বললেও
অনিশ্চিত অন্ধকারে ঠেলাগাড়ির মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে
ধীর গতিতে পথ চলি...

ছলকে ওঠা– অশ্রুমাখা নীল কষ্টের রেণুগুলো একসময়
যান্ত্রিক জীবনের উত্তাপে দুমড়ে-মুচড়ে
ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়...।

এই আমি সেই আমি

লিলি হক

জীবনের এত পথ হাঁটাহাঁটি
শারীরিক ভগ্নাংশ পরিত্যক্ত সামগ্রীর মতো
থালা-বাটি-গ্লাস-তৈজস সবই তো কাঙ্ক্ষিত
শুধু এই আমি ব্যথিত সমর্পিত
বউ-চি খেলার বউ ধরা পড়েছি
ছোটবেলার কোনো এক ভরা ভাদরে
শুনে শুনে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়।

শাশুড়ি-ননদের অজস্র উপদেশ
ঘোমটা মাথায় রা'টি করার উপায় ছিল না
মফস্বলি অন্দরে বাতাস ঢোকার নেই তো উপায়
লেখাপড়ার ইতি ঘটল সূচনাতেই
স্বপ্ন হয়ে রইল মনে স্কুলের মুখরিত প্রাঙ্গণ
লেখার টেবিল, গোল্লাছুট, এক্কাদোক্কার নিকানো উঠোন।

মনে পড়ে বাবা আমার স্কুলে ভর্তির আগে
ভালো করে লিখিয়ে শিখিয়েছিলেন পুরো
নাম-ঠিকানা, ছেলে ধরার কবল থেকে উদ্ধার
পাওয়ার প্রত্যাশায়, কি আশ্চর্য আত্মীয় স্বজন
পরিবেষ্টিত নাম ঠিকানা মুখস্থ
সেই আমি বাবা-মায়ের বুকের নিধি কোনো
এক অদৃশ্য শক্তির কবলে পড়ে গেলাম
চিরতরে।

মহাসমারোহে ঘটে গেল
বিরাট আয়োজন পুতুল বিয়ের আনন্দ,
এ যেন বিনা বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনে
নির্দোষ মানুষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

কিছু সময় রেখো

কামাল হোসাইন

আমার জন্য একটু সময় বরাদ্দ রেখো হাতে।
আমার এই উলোঝুলো দিনগুলোয় একটু
আবির মাখিয়ে ধন্য করো আমায়।

কোথাও তো প্রশান্তির কোনো মেলা বসেনি;
যেখান থেকে চাইলেই প্রয়োজনে সুখ কেনা যায়।
আনন্দ খরিদ করা যায়।
চাইলেই ইচ্ছেঘুড়িটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায়
দূর দিগন্তের শেষ সীমারেখায়।

চারদিকে কেবলই মন খারাপের মেলা।
এত ঢোল, এত বাঁশি, এত যে হই-উল্লাস,
কিছুই যে স্পর্শ করে না আমায়!
তবে কি আমি অনুভূতিহীন মানুষ নামের কেউ?

আমার জন্যও কিছুটা সময় বরাদ্দ রেখো বন্ধু।
এই সময়ে অন্তত আমায় তুমি
প্রশান্তির বাঁশি বাজাতে দিও।

শেখ হাসিনা

মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান

জননেত্রী তুমি হলে প্রিয় শেখ হাসিনা
তোমায় ছাড়া লোকে এখন কিছুই বোঝে না।
তুমি হলে শান্তির দূত, উন্নয়নের মডেল।
পাহাড়ে তুমি এনেছ শান্তি, উন্নয়নও অঢেল।
বিডিআর বিদ্রোহ করেছ দমন একক নেতৃত্বে ।
কোটি মানুষ পেয়েছে শান্তি তোমার কথাতে।
লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ পেয়েছে মুক্তি।
ছিটমহল বিনিময়ে তুমি করেছ চুক্তি।
লক্ষ শিশুর হাতে তুমি দিয়েছ নতুন বই।
তারা এখন আনন্দে তাই নাচে থৈ-থৈ।
মা ও শিশুর চিকিৎসাসেবায় বিশ্বস্বীকৃতি।
তোমার তরে বিশ্বনেতাগণের মাথা অবনতি।
তোমার জন্য দুহাত তুলে করছে কত দোয়া।
অবহেলিত দুস্থ মানুষ হাতে পেয়ে মাসোহারা।
ডিজিটালাইজ করে তুমি দিচ্ছ কত সেবা।
এমন আইডিয়া আগে কখনো শুনেছে কে-ই-বা।
সমুদ্রসীমা জয় করে 'মানচিত্র' রেখেছ সমুন্নত।
পদ্মাসেতু তৈরিতে মানুষ হয়েছে আশান্বিত।
তোমার সময়ে দেখে মানুষ উন্নয়নের জোয়ার।
অর্থনীতি বাড়ে যেন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার।
হাজার রকম প্রকল্প আর অবকাঠামো।
বাংলাদেশের চিত্র আজ উন্নত দেশসম।

মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কনক চৌধুরী

জোছনার জন্ম চাঁদের মাটিতে
সে জোছনা এসে পড়ে পৃথিবীর গায়ে।

প্রাচ্যের মেয়েরা বাবার বাড়ি ফেলে
অন্যের বাড়ি গিয়ে ঘর বাঁধে।
তাদের এমন কাজে অকৃতজ্ঞ বলে মনে হয়
তারপরও করতে পারি না কোনো বিরূপ মন্তব্য।

কেউ তাদের অশ্লীল কিছু বললে
ইচ্ছা হয় কথা কাটাকাটি পাছে হাতাহাতিতে নামি।

আমাকে যে তাদের সম্মান করতেই হয়
এ সবই শুধু একটি মেয়ের জন্য।
যে কি-না আমার জন্মের পর
এই কুৎসিত ছেলেটাকে চাঁদের দিকে তুলে ধরে বলত
'আয় আয় চাঁদ মামা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা'
কে সেই চাঁদ আর কে সেই চাঁদ মামা?
সে কথা মনে হলে আজও হেসে গড়াগড়ি যাই।

কপালের এক কোণে কালির টিপ লেপে রাখত
যাতে কারো নজর না লাগে।
মা, তোমার কুৎসিত ছেলের প্রতি কার নজর লাগবে?
তাঁর সেই মনগড়া ভয় দেখে আমি আজও হেসে কুটিকুটি।

তারপরেও বলি
মা, তোমার আকাশে আমি চাঁদ হয়ে থাকলে
আমার আকাশে তুমি পৃথিবী।
বহুদূরের পথ থেকে এই মহাবিশ্বকে দেখলে
পৃথিবীই সব থেকে সুন্দর, সে-ই মায়াবী।

মা, তুমি বড়ো অযৌক্তিক!
কি যে তোমার পক্ষপাত!
তোমার বিরুদ্ধে এতবড়ো অভিযোগের জুরি পাওয়া ভার।

সভ্যতার বাতিঘর

সাঈদ তপু

শ্রমিকের নোনা ঘামে নির্মিত
ধনিকের ঝলমলে প্রাসাদ
শিল্পীর তুলির মতন হাত দুটি
ক্রমশ ইস্পাতের কঠিন ধাতবে পরিণত
জীবনের দামে ওরা
নির্মাণ করে সভ্যতার খুঁটি।
ডাল আর রুটি খেয়ে
এই শ্রমিকের ঘামের সিঁড়ি বেয়ে
উপরে ওঠে ভোগবাদী পুঁজিবাদ
অথচ কারিগরের সব অবদান ভুলে গিয়ে
টুটি চেপে ধরে দাম্ভিক বেহায়ারা।
দাবাড়ু ও গুটির মতন
বিভক্তি নেমে আসে
পৃথিবী নামক চালনার কোটে
সভ্যতার বিকাশের বদলে তৈরি হয়
বিকারগ্রস্ত মনুষ্যত্ব
ক্ষয়িষ্ণু মনস্তত্ত্ব
অথচ মনস্তত্ত্বের বিকাশেই লুকিয়ে থাকে
পরিমেয় মানব সভ্যতা।
সভ্যতার বিকাশ চাও ?
মনস্তত্ত্বের বিকাশ ঘটাও
মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাও
ভোগবাদের প্রথা ভেঙে
উপর থেকে নেমে এসো মাটিতে
হাত রাখো সভ্যতার বাতিঘর
নিপীড়িত শ্রমিকের হাতে।

কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সমীরণ বড়ুয়া

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর ঘরে জন্মেছিলেন রবি
ডাগর চোখে দেখত চেয়ে আঁকত কেবল ছবি।
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ইশকুলেতেই যায়
উদাস মনে ক্লাসে বসে মেঘের পানে চায়।
ফুল-পাখিদের সাথে তিনি করেন সদা ভাব
ছুটি শেষে রোজ বিকেলে খেতেন কঁচি ডাব।
বৃষ্টি এলে ছুটিয়ে যেতেন জোড়া দিঘির মাঠে
ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ায় প্রজাপতির হাটে।
লেখাপড়ায় বসত না মন, শাসন ছিল কড়া
পড়ার ফাঁকে লিখত কত কাব্য, নাটক, ছড়া।
রাঙা পথের ধুল উড়িয়ে যেতেন সবুজ বনে
পথ হারিয়ে সারা বনে, ঘুরত যে আনমনে।
লিখেছিলেন 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'চোখের বালি'
'বলাকা' ও 'ঘরে বাইরে' কল্পনায় রং ঢালি।
'মানসী' তাঁর 'বিসর্জন' ও 'শেষের কবিতা'য়
'ক্ষণিকা' ও 'ডাকঘরে' বেশ আছে 'সবিতা'য়।
'রক্তকরবী' লিখেন 'গোরা' – কাব্য 'গীতাঞ্জলি'
নোবেল জয়ী কবিগুরুর পথেই আমি চলি।
সোনার বাংলার কবি তুমি, রেখেই গেলেন গান
গানের সুরে আকুল যে হই, জুড়ায় আমার প্রাণ।
'নির্ঝরেরি স্বপ্নভঙ্গ'– 'সঞ্চয়িতা'য় পায়–
জন্মদিনে হাজার প্রণাম জানাই কবিতায়।

অদম্য ইচ্ছাশক্তি

স্বপন মোহাম্মদ কামাল

আমার অদম্য ইচ্ছাশক্তি অপ্রতিরোধ্য
সুনামির মতো উন্মাদিত,
কেশরশোভিত সিংহের ক্ষুধার্ত রুদ্রের গতি।
সেই অভীষ্ট ইচ্ছাশক্তি– যেন এক ক্ষিপ্রগতি ব্যাঘ্র

ইচ্ছার শিকার ধরতে সে এক চৈতন্যের জাল বিছিয়ে রাখে অন্ধ জনপদ,
আত্মপ্রত্যয়ের পরতে পরতে এক একটি ধাপ অতিক্রম করে
অসীম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সপ্ত আসমানের আলোকবর্ষ পথ।
এই অদম্য তেজের বিপক্ষে শঙ্কিত আমি নিজেই লাগাম টানি
এই পাগলা ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণে ক্লান্ত সওয়ারির মতো
প্রকম্পিত করি পৃথিবীর দুর্ভেদ্য পথের শরীর।
আমার অদম্য ইচ্ছাশক্তি– ছুটে আসে ঝটিকার মতো মহা তাণ্ডবে

সে জ্বলে উঠতে পারে দাবাগ্নির মতো
নেভাতে পারে অঝোর বর্ষণে
সে প্রাচীন জনপদ মুহূর্তেই ধ্বংস করে ভূমিকম্পের মতো
নির্মাণ করতে পারে সৃষ্টিশীল কুশলীর মতো।
সে তলিয়ে দেবে মহা প্লাবনের মতো পাপিষ্ঠের অঞ্চল
সে সুশীল মানুষ নিয়ে ভাসাবে নূহের সাম্পান।

আমার আত্মা পাখিদের চেয়েও স্বাধীন
অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিপুণ জাদুকর হয়ে ইচ্ছার স্বপক্ষে
তোমাদের বিষণ্ন মঞ্চ আজ মুখর করব আনন্দের জোয়ারে।

হিমাদ্রির ওজন বুকে নিয়ে স্বপ্ন আঁকব তোমাদের মানচিত্রে।
আমার ইচ্ছা মানেই পৃথিবীর সকল কবিদের ইচ্ছা
আমার ইচ্ছা মানেই যুদ্ধরত মানুষের ইচ্ছা
আমার ইচ্ছা মানেই সৃষ্টিশীল উদ্যমীর প্রত্যাশা।
বলো–এতগুলো শক্তি তুমি কীভাবে মাড়াবে?

দাদু হতাম যদি

রকিবুল ইসলাম

আমি যদি হতাম দাদু
দেখিয়ে দিতাম কত্ত জাদু!

আব্বাকে ডেকে নিয়ে বলতাম– ওরে
জাগলি না কেন তুই কাকডাকা ভোরে?
আব্বা তো ভয়ে ভয়ে ভীরু পায়ে কাঁপত
কী যে করি থরো থরো আনমনে ভাবত।

চাচাজান খুব পাঁজি যায় না সে কলেজে
সকাল আর সন্ধ্যায় কান দুটো মলে যে!
রেগে কথা বলতাম
কান দুটো মলতাম।
তারপর কানে ধরে উঠবস করাতাম
সকাল আর সন্ধ্যায় ব্যাকরণ পড়াতাম।

ছোটো ফুপি মেজাজি সারাক্ষণ জ্বালাতো
আমাদের ন্যাড়াদল তার ভয়ে পালাতো।
চোখ দুটো লাল করে হাতে নিয়ে লাঠিটা
থাপ্পড়ে ফেলে দেব দাঁতের ঐ পাটিটা।

আম্মা তো প্রতিবেলা জোর করে খাওয়াতো
যতবার ধুলা মাখি ততবার নাওয়াতো।
কাছে ডেকে বলতাম– চলবে না ঐসব
এখন আর নই ছোটো ছেলেখেলা শৈশব।

স্বপ্ন

জুনান নাশিত

ঠিক করেছি গাছ হব, মানুষ নয়
দীর্ঘ বাকল জুড়ে আঁকিবুঁকি ক্ষতচিহ্নগুলো
তুলে ধরবে তোমাদের তামাশা
ফেরিওয়ালার হাঁক থেকে ঝরে পড়া আর্তনাদ
ডালপাতা ধরে ধরে যখন পৌঁছে যাবে
তোমাদের ঘরে
কতটা বীভৎস তোমরা, টের পাবে।

আয়নায় দেখা নাসিরনগর, গোবিন্দগঞ্জ
কিংবা রাখাইন উপত্যকার গল্প বড়ো বেশি ফানুস
ঠিক নিজেদের প্রতিবিম্বের মতো।
মনে করো, এভরিথিং ইজ ওকে
দেয়ার ইজ নো অবজেক্টর।

আমি তাই গাছ হতে চাই
স্বপ্ন পুষি। একদিন ঠিক...
যদিও খানিক দূরেই লটকে আছে ঝড়ের পূর্বাভাস।

মায়ের কাছে প্রশ্ন

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

শান্ত খোকন প্রশ্ন করে মাকে,
বনের হরিণ চিড়িয়াখানায়
বন্দি কেন থাকে?

বানর কেন নাচতে থাকে
লাঠির তালে তালে,
ভুল হলে তো অমনি সাজা
চড় মারে দুই গালে।

বাঘ ভালুক হাতি ঘোড়া
তাদের দেখি রোজ,
বন্দি খাঁচায় সবাই কাতর
কেউ রাখে না খোঁজ।

ময়না টিয়ে বকতে থাকে
শিখানো সব বুলি,
সারাজীবন এমনভাবে
যাবে কি দিনগুলি।

বড্ড খারাপ লাগে মাগো
বড্ড খারাপ লাগে,
আমিতো মা রাজা হলে
মুক্তি দেবো আগে।

বনের পাখি থাকবে বনে
বাঘ ভালুক হাতি,
মুক্ত হয়ে সব পশুরা
করবে মাতামাতি।

কবি নজরুল

গোলাম নবী পান্না

বিদ্রোহী কবি, যাঁর মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
চিনতে তাঁকে কারো হয় না একটু ভুল।
বিদ্রোহী লেখা দিয়ে বাঁধান হুলস্থুল,
বৃথাই ব্রিটিশ শাসন, চড়াতে পারেনি শূল।
তাকে ঘিরে দিশেহারা হারায় পথের কূল
দুঃশাসনের যিনি উপড়ে ফেলেন মূল।
কবিতায় ফোটালেন জ্বালাময়ী হুল
এমনটি মেলা ভার, নেই তার তুল,
তিনিই আবার গানে থেকে মশগুল
সুর-ঝংকার নিয়ে হন বুলবুল।
সাহিত্যে ছড়ালেন কত নানা ফুল
উপমার কানে কানে পরালেন দুল,
তিনি সবার প্রিয় 'কবি নজরুল'।

মা কোথায়

সাদিয়া সুলতানা

মা কোথায়
বুকের ভেতর,
বাইরে যা দেখি
দেহ যেন ভিন্ন
সব থেকে নন তিনি ছিন্ন,
কেউ বলে বোন তুই
ধুপধাপ চলে যাস
কেন রে পাগল!
বল দেখি,
কেন দ্বারে
লেগেছে আগল?

যার যত মেঘ
মনের ভেতর–
জমে থাকা
নুনের আকর,
একটু নিলাম–
নিলাম তাহার শিশির ধারণ দৃষ্টি
মা কতটা মায়ের আড়াল,
দুঃখ গহীন রাত্রির!

মা

রোকসানা গুলশান

সে এল
উষ্ণ-কোমল-অলৌকিক-গোলাপ সুবাসে
জীবনের আকাঙ্ক্ষার সন্তান সে এক–
কী মায়াময়-করুণ!
প্রথম কান্নাধ্বনি তাঁর–কাঁদালো আমাদের
কৃতজ্ঞতায়।
প্রথম স্পর্শ তাঁর জাদুমাখা শব্দধ্বনি– 'মা'
চিরচেনা-চির আশ্রয়।
'ছিলাম তারাফুল হয়ে– নিঃসীম অন্ধকারে
অনন্ত আলো পেয়ে এক, উঠি জেগে–
প্রতীক্ষা তারপর।
খুঁজেছি তোমায় হাজার মায়ের মাঝে
কত যে কাল–
যেদিন রাঙা হলো তোমারও হৃদয়, আলো ছোঁয়ায়
সেদিনই চিনতে পারি তোমায়–
মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে, কত দূর থেকে
তাইতো এলাম তোমারই কোলে
এই সূর্যালোকের দেশে।
মা যে তুমি আমার– কতকালের।
যেন থাকি তোমারই বলয় জুড়ে
মানুষের মতো মানুষ হয়ে।
দৃষ্টি তাঁর আরো যে বলে–
যা কিছু জীবনের ভালো জমা
জানি সে তোমারই আলোর কারণ
ওড়াবো তাই বিজয় নিশান, আলো সম্মানের
মুছে দিও ক্লান্তির ঘাম আঁচলে তোমার
তোমাকে শোনানোর হৃদয়ের গল্প আছে যত
যেন হয় বলা– মায়াভরা এক জীবনে।
মা-গো, একাকী আমায় রেখে–
যেওনা চলে দূরে।
মা এবার প্রতীক্ষায় থাকে
আলোকিত গৌরব দিনের–
সেইসাথে আমরাও।

হাসো নদী

অতনু তিয়াস

সভ্যতার সাথে আড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো না
আবাহন করি অনন্ত যৌবন
দুরন্ত মেঘের সাথে দূরপাল্লায়
পুনরায় হও স্রোতস্বিনী...

অনিশ্চিতির ভাঙা গান বুকে
প্রতিদিন জীবনসংগ্রাম
আশ্রয় ভেঙে যাওয়া পাখিরা নিরুদ্দেশ
নিষ্ফলা মাটির আর্তনাদ।

মানুষের ঘামের দোহাই
সমস্ত প্রাণের দোহাই
হাসো নদী...
হাসো...
সবুজে প্লাবিত হও এপার-ওপার।

ভালোই করেছ তুমি

আরেফিন রব

ভালোই করেছ তুমি, ভুলে গেছ
ভুলে গেছ গুটি পায়ে শিশিরের বুকে
নিভৃতে হাঁটা
কাকডাকা ভোরে সরষে দোলানো হাসি
প্রচণ্ড দুপুরে তীব্র গরমে
ক্লান্ত শরীরের ফসফসানি
ভালোই করেছ তুমি।
চায়ের আড্ডায় ভীষণ উষ্ণতায়
অবাধ্য মনের খেয়ালি লুকোচুরি
কখনো-বা চায়ের উষ্ণতার চেয়েও
প্রচণ্ড উষ্ণ ছিলে তুমি।
বইমেলার উপচে পড়া ভিড়ে
হঠাৎ হারিয়ে ফেলে, বুকের ধুকধুকানি
সব ভুলে গেছ? ভালোই করেছ তুমি
মাঘের কনকনে শীতে
আইল্যান্ডের পাশে জবুথবু হয়ে
অপেক্ষার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা
হঠাৎ আলোর ঝলকানি
ভুবনমোহিনী হাসি, সব ভুলে গেছ?
টেলিফোনে কত শত কথা
আমার ববকানি, তোমার হুঁ-হ্যাঁ শব্দ
ভীষণ উত্তেজিত, তোমার বিনীত জবাব শুনছি তো!
সব ভুলে গেছ? ভালোই করেছ তুমি
শিশিরসিক্ত সকাল, ক্লান্ত দুপুর, পড়ন্ত বিকেল
চায়ের আড্ডা, ফোনালাপ
সব ভুলে গেছ, ভালোই করেছ তুমি।

মেঘেদের নীল আঁচল

বাপ্পি সাহা

আকাশ হবো আকাশ একবিন্দু জলে
আমি নদী হবো নদী, ভালোবাসা পূর্ণ বিলাসে।
মেঘ হবো মেঘ শিশিরের ডগায়
সবুজ হবো সবুজ, মাতৃভূমির শীতল ছায়ায়।
আমি স্মৃতি হবো...
এই পৃথিবীর প্রতি পরতে পরতে।
থাকব না আমি
রইবে চেয়ে মেঘেদের নীল আঁচল।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, বিশ্বকে বসবাসের জন্য একটি নিরাপদ স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে সামাজিক বৈষম্য, মানবিক অসমতা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৩৬তম ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সম্মানে ৪ঠা এপ্রিল বঙ্গভবনে দেওয়া ভোজসভায় রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৪ঠা এপ্রিল ২০১৭ আইপিইউ সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দের সম্মানে বঙ্গভবনে আয়োজিত নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

বৈশ্বিক সন্ত্রাস প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শুধু উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকি নয়, এটি মানবসভ্যতার জন্যও একটি অভিশাপ। তিনি গোটা মানবজাতির স্বার্থে এর নির্মূলে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এদেশ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতি সমর্থন এবং সংহতি প্রকাশ করেছেন।

প্রতিটি দেশের সংসদ সদস্যরা তাঁদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের দেশে এবং অন্য দেশগুলোতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসমতা দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন বলে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করার আহ্বান

ময়মনসিংহের ত্রিশালে ১৯ শে এপ্রিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাণিজ্যিকীকরণ শিক্ষার গুণগতমান ব্যাহত করে। অনেক ক্ষেত্রে মেধা বিকাশের পথকে বাধাগ্রস্ত করে। এলক্ষ্যে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সাফল্যের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। শিক্ষায় ও দক্ষতায় তাদের আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তুলতে হবে'। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের মেধা বিকাশে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী অটিস্টিক শিশুদের মেধার বিকাশ ঘটাতে তাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করার ওপর জোর দেন। অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কাজের প্রতি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একাগ্রতা থাকে অনেক বেশি এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতিও অন্যদের তুলনায় বেশি। এলক্ষ্যে চাকরির সুযোগ দিয়ে প্রতিবন্ধীদের সূক্ষ্ম মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়া বিসিএসসহ সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে অটিজমসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি অটিজম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সফল ব্যক্তি, অটিজম উত্তরণে অবদান রাখা সফল প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর : ২২ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারদিনের সরকারি সফরে ৭ই এপ্রিল ভারত সফরে যান। ভারতের নয়াদিল্লিতে পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বিমানবন্দর থেকে কঠোর নিরাপত্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাইসিনা হিলে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে। সফরকালে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। ৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসহ ২২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। হায়দরাবাদ হাউসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রতিরক্ষা খাতে ৫০০ কোটি ডলার ঋণ চুক্তিও হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রাজধানীর নয়াদিল্লিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লেন' নামে একটি সড়কের নামফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এছাড়া হিন্দিতে অনূদিত বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের মোড়কও উন্মোচন করেন দুই প্রধানমন্ত্রী।

৯ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিকেলে ভারতের কংগ্রেস দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। একই দিন প্রধানমন্ত্রী আজমীর শরিফ যান এবং বাংলাদেশের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির দেওয়া নৈশভোজে যোগ দেন। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও ভারতের শীর্ষ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক সেমিনারে যোগ দেন। পরে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই এপ্রিল আগারগাঁও-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নবনির্মিত বহুতল ভবন উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন জানতে পারে কত বড়ো ত্যাগের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সেই স্মৃতিচিহ্নগুলো তারা দেখবে, উপলব্ধি করবে এবং অন্তরে ধারণ করবে'। তিনি দেশের প্রতিটি জেলা- উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হবে বলে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই এপ্রিল তিনদিনের সরকারি সফরে ভুটান যান। ভুটানের পারো বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে সেনা সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন এবং সেখান থেকে তাঁকে মোটর শোভাযাত্রা সহযোগে লো মেরিডিয়ান থিম্পু হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ঐ হোটেলেই অবস্থান করেন। প্রধানমন্ত্রী ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তেসারিং তোবগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তাঁদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক ৫টি দলিল স্বাক্ষর হয়। এর মধ্যে ৩টি সমঝোতা স্মারক এবং ২টি চুক্তি। বাংলাদেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব সুরাইয়া বেগম, পররাষ্ট্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই এপ্রিল ২০১৭ ভারতের নয়াদিল্লীতে পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান –পিআইডি

সচিব মো. শহীদুল হক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ-এশিয়া বিষয়ক ডিজি মনোয়ার হোসেন। ভুটানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা। পরে প্রধানমন্ত্রী রয়্যাল ব্যাঙ্কুয়েট হলে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভোজসভায় যোগ দেন। ১৯শে এপ্রিল ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে রয়েল ব্যাঙ্কুয়েট হলে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার' শীর্ষক সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন। একই দিন প্রধানমন্ত্রী ভুটানে বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যান্সেরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেন। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার ন্যামগেল ওয়াংচুক এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাসো তেসারিং তোবগের উপস্থিতিতে এই নামফলক উন্মোচন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষে ২০শে এপ্রিল দেশে ফেরেন।

পাহাড় ও হাওর অঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয় করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই এপ্রিল ২০১৭ ভুটানের রাজ প্রাসাদে তাঁর সম্মানে গার্ড অভ্ অনার পরিদর্শন করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে এপ্রিল তাঁর কার্যালয়ে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পাহাড় ও হাওর অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘবে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর নির্দেশ প্রদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের দেওয়া শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

র‍্যাব সদস্যদের প্রতি সজাগ থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে এপ্রিল কুর্মিটোলায় র‍্যাবের সদর

দপ্তরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দরবারে অংশগ্রহণ করেন। দরবারে ভাষণকালে দেশের সাধারণ নাগরিকরা যেন অহেতুক নির্যাতনের শিকার না হয় সেজন্য সজাগ থাকতে র‍্যাব সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

জঙ্গিমুক্ত সুস্থ দেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে চলচ্চিত্র

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রাঙ্গণে দিবসের কর্মসূচির উদ্‌বোধন ঘোষণা ও স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচনকালে বলেন– জঙ্গিমুক্ত, সুস্থ, সুন্দর গণতন্ত্রের বাংলাদেশ গড়তে এদেশের চলচ্চিত্র সুদৃঢ় ভূমিকা রাখবে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৩রা এপ্রিল ২০১৭ বিএফডিসি প্রাঙ্গণে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৭-এর উদ্‌বোধন শেষে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির পিতা চলচ্চিত্র জগতে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন, তা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে বেগবান করেছে, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিদের প্রেরণা জুগিয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসে বাংলাদেশের মানুষ তাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।

তথ্যমন্ত্রী ৩রা এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ও চলচ্চিত্রকে শিল্প ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি চলচ্চিত্র জগতের সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণের আশ্বাস

তথ্যমন্ত্রী ৮ই এপ্রিল শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ (এফএফএসবি) আয়োজিত প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণের আশ্বাস দেন।

সংবিধানের চার নীতিতে অটল থাকার নির্দেশ

তথ্যমন্ত্রী ২১শে এপ্রিল প্রেস ইনস্টিটিউটে বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষণকালে মন্ত্রী সংবিধানের চার মূলনীতি: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতায় অটল থেকে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগে বিসিএস তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২১শে এপ্রিল ২০১৭ পিআইবি মিলনায়তনে বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুর্নর্মিলনীতে বক্তৃতা করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট সংসদ সদস্য কাজী রোজী, তথ্যসচিব মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার ও রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন – পিআইডি

মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় দেশ ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গি ও তাদের দোসরদের বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের শত্রুদের চিনতে হবে এবং তাদের থেকে দূরে থাকার কোনো বিকল্প নেই।

তথ্যসচিব মরতুজা আহমদ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার-কে সভাপতি ও ফায়জুল হককে মহাসচিব করে ২০১৭-২০১৯ মেয়াদে গঠিত বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশন-এর উনিশ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক সম্পন্ন হয়।

দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা জনসংযোগ কর্মকর্তাদের পবিত্র দায়িত্ব

তথ্যমন্ত্রী ১৬ই এপ্রিল বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) সেমিনার হলে বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির নবনির্বাচিত পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভায় বলেন, দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা জনসংযোগ কর্মকর্তাদের কাজের অবিচ্ছেদ্য ও পবিত্র অংশ।

মূলত বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর জনসংযোগ কর্মকর্তাদের এ সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, নিজস্ব সংস্থার পক্ষে জনসংযোগ পরিচালনায় দেশ ও জনগণের স্বার্থ সব সময় অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, সমৃদ্ধ ও দক্ষ জনসংযোগের জন্য নিজের সংস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখার বিকল্প নেই। কারণ, জনসংযোগ কর্মকর্তারা সংস্থার সুনাম তৈরি ও রক্ষার কাজেই নিয়োজিত ।

চাই অপরাধীমুক্ত রাজনীতি ও মিথ্যাচারমুক্ত গণমাধ্যম

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৩০শে এপ্রিল বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর সেমিনার হলে সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার -২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, গণতন্ত্রের স্বার্থেই রাজনীতিকে অপরাধীমুক্ত ও গণমাধ্যমকে মিথ্যাচারমুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

মন্ত্রী এ সময় 'রক্ত বাণিজ্য' শীর্ষক অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের জন্য আরফাতুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে সাংবাদিকতায় নৈতিকতা, বস্তুনিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রম, জানার আগ্রহ, মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ১৬ই এপ্রিল ঢাকার আগারগাঁও-এ স্থানান্তরিত হলো। সরকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টিবোর্ডের কাছে শেরে বাংলা নগরে আড়াই বিঘা জমি বরাদ্দ দেয়। ১৫ই এপ্রিল ২০১১ জাদুঘর নির্মান কাজ শুরু হয়। ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গফুটের এ ভবনের নকশা তৈরি করেন স্থপতি দম্পতি তামজী হাসান ও নাহিত ফারজানা। এর পূর্বে 'সত্যের মুখোমুখি হন, ইতিহাসকে জানুন '– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা সেগুনবাগিচার একটি পুরনো দোতলা বাড়িতে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজামান নূর, মফিদুল হক, আলী যাকেরসহ ৮ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এই জাদুঘরের প্রথম উদোক্তা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই এপ্রিল ২০১৭ আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্‌বোধন শেষে ঘুরে দেখেন – পিআইডি

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই আগামী প্রজন্মকে ইতিহাস জানতে হবে- এই মন্তব্য করে ১৬ই এপ্রিল ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্‌বোধন করেন। ৯ তলা বিশিষ্ট এ ভবনে মাটির নিচে ৩টি এবং উপরে ৬টি তলা রয়েছে। ভবনটিতে গ্যালারি রয়েছে ৪টি। প্রতিটি গ্যালারির আয়তন ৫ হাজার বর্গফুট। যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, চিঠিপত্র, '৭১-এর দলিলপত্রসহ প্রায় ১৭ হাজার ৫শ নিদর্শন রয়েছে জাদুঘর গ্যালারিগুলোতে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল সময়। বাঙালির ধারাবাহিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ও অনিবার্যভাবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ।

তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় ।

মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করা হয়। সেদিন থেকে এ স্থানটি 'মুজিবনগর' নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ ও তদানীন্তন ইপিআরসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। **প্রতিবেদন: মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা**

ঢাকায় আইপিইউ সম্মেলন উদ্‌বোধন

১লা এপ্রিল : জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ১৩৬ তম আইপিইউ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ই এপ্রিল বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমানোর অঙ্গীকার নিয়ে শেষ হয় পাঁচ দিনব্যাপী ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) সম্মেলন। আইপিইউ'র সাধারণ অধিবেশনে পাঁচ দফা ঢাকা ঘোষণা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

২রা এপ্রিল : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা এপ্রিল ২০১৭ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর ১৩৬তম আইপিইউ অ্যাসেম্বলির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৩রা এপ্রিল : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে জনস্বার্থে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবর ও শ্মশানের জমি অধিগ্রহণ করা যাবে– এমন বিধান রেখে স্থাবর সম্পত্তি অধিকরণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭- এর খসড়া অনুমোদিত হয়।

একনেক বৈঠক

এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) সভায় চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমেটরি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পসহ সাতটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

ওলামা মাশায়েখ মহাসম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

৬ই এপ্রিল : ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ওলামা-মাশায়েখ মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত

৭ই এপ্রিল : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'আসুন, বিষণ্নতা নিয়ে কথা বলি'।

জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে পারে স্কাউটিং: রাষ্ট্রপতি

১২ই এপ্রিল : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শিশু-কিশোর-যুবকদের ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম।

হাতিরঝিলে মুক্তমঞ্চ ও বর্ণিল ফোয়ারা উদ্‌বোধন

১৩ই এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের অ্যাম্ফিথিয়েটার ও ফোয়ারা উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নাগরিকদের বিনোদনের জন্য এগুলো তাঁর নববর্ষের উপহার।

বর্ষবরণ উদ্‌যাপন

১৪ই এপ্রিল : সারাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান।

১৫ই এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর কাকরাইলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য নবনির্মিত আবাসিক ভবন উদ্‌বোধন করেন।

১৬ই এপ্রিল : রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নবনির্মিত বহুতল ভবন উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

১৭ই এপ্রিল : নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭- এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। এছাড়া বৈঠকে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭-এর খসড়া এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪- এর বিধানাবলি, আয়কর আইন ২০১৭ অনুমোদন লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের রেপ্লিকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম।

২৩শে এপ্রিল : শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আধুনিক শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের দেওয়া শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

২৪শে এপ্রিল : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিদেশ থেকে আফ্রিকান মাগুর ও পিরানহা মাছ আমদানি করলে জেল-জরিমানার বিধান রেখে মৎস্য সঙ্গ-নিরোধ আইন ২০১৭- এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে' বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'চিরতরে ম্যালেরিয়া হোক অবসান'।

২৭শে এপ্রিল : গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে

৮ই এপ্রিল

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

৮ই এপ্রিল পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৭২ সালের ৮ই এপ্রিল প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার (পিও)-৩৪ আদেশবলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের হল রুমে সেমিনার ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে 'বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে প্রজাতন্ত্রের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জনপ্রশাসনে দক্ষ জনবল নিয়োগে পিএসসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। প্রবন্ধে স্বল্পতম সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নিয়োগ, লিখিত পরীক্ষার খাতা দ্বিতীয়বার মূল্যায়ন এবং বিসিএস (তথ্যপ্রযুক্তি) নামে নতুন একটি ক্যাডার সৃজনের প্রস্তাব করা হয়। আলোচনায় পিএসসির বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, পিএসসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস' পালনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিএসসির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে

৮ই এপ্রিল ২০১৭ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পিএসসি আয়োজিত সেমিনার ও আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম –পিএসসি

তা আমাকে আনন্দিত ও গর্বিত করেছে। তিনি বলেন, অনেক রক্ত, অশ্রু এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে যে দেশ পেয়েছি সে দেশের মানুষের দারিদ্র্য দূর করে তার জীবনমান উন্নত করার যে মহতী উদ্যোগ– তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করছে।

বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে পিএসসি আগের থেকে অনেক দ্রুততার সাথে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার আরো গতিশীল করতে চায়। এ লক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অব্যাহতভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পিএসসি চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক বলেন, নতুন সহস্রাব্দে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় জনপ্রশাসনে দেশপ্রেমিক, দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা, দক্ষতা ও সততা নিয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে। পিএসসি'কে আরো গতিশীল করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন। **প্রতিবেদন: মো. জাহিদ হোসেন চৌ.**

চট্টগ্রাম বন্দরের ১৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কারশেডে আয়োজিত পোর্ট এক্সপো ২০১৭ এবং ডিজিটাল দ্বীপ মহেশখালী প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সফররত সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে প্রধানমন্ত্রী

২৮শে এপ্রিল : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পারস্পরিক দোষারোপের পথে না হেঁটে সংসদ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ সবাইকে সমঝোতার মাধ্যমে আরো সচেতনতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস

২৯শে এপ্রিল : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় 'আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস'।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি চাকরিজীবীদের সততার পুরস্কার

কাজে দক্ষতা বাড়াতে ও নৈতিকতায় উৎসাহিত করতে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চালু করা হচ্ছে সততার পুরস্কার। প্রতিবছর ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। দক্ষ ও সভ্য হিসেবে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও সনদ দেওয়া হবে। পুরস্কারের আওতায় আসবেন মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী থেকে শুরু করে সিনিয়র সচিব পর্যন্ত কর্মকর্তারা। এলক্ষে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা -২০১৭ প্রণয়ন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। নীতিমালায় শুদ্ধাচারের ১৮টি সূচকের ভিত্তিতে এ পুরস্কারের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারি নির্বাচন করা হবে।

খাদ্য নিরাপত্তায় সক্ষম বাংলাদেশ

নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই বাংলাদেশ খাদ্য-নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সরকার এখন ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। ঝুঁকিভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদবোধন অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এসব তথ্য দেন। খাদ্য নিরাপত্তার কাজটি পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে করত। বিভিন্ন সংস্থার কাজকে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে এবং একই ছাতার নিচে আনার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। ১৮টি মন্ত্রণালয় এবং ৪৮০টি সংস্থা এ কাজের সঙ্গে যুক্ত। ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।

সারাদেশে ৫৬০ মডেল মসজিদ

মসজিদগুলোকে ইসলামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সারাদেশে ৫৬০টি মসজিদ তৈরি করা হবে। সব জেলা ও উপজেলায় একটি করে এই মসজিদ থাকবে। শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী ৫৬০টি মসজিদের প্রকল্প অনুমোদন করেন।

অবসরে যাওয়া সরকারি চাকরিজীবীগণ বৈশাখি ভাতা পাবেন

অবসরে যাওয়া সরকারি চাকরিজীবী যারা শতভাগ পেনশনের টাকা তুলে নিয়েছেন তারাও বৈশাখি ভাতা পাবেন। অর্থ মন্ত্রণালয় এ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। শতভাগ পেনশন সমর্পনকারীর সংখ্যা প্রায় ৯৫ হাজার । এসব কর্মচারীরা যে পরিমাণ নিট পেনশন প্রাপ্য হতেন তার ২০ শতাংশ হারে বৈশাখি ভাতা পাবেন।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশীয় সাটেলাইট উৎক্ষেপণ

সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হলো দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট জিস্যাট-৯। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ৫ই মে স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৫৭ মিনিটে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই মে ২০১৭ গণভবনে ভারতসহ ছয়টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন – পিআইডি

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এ উপগ্রহ উৎক্ষেপণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সফল উৎক্ষেপণের পর নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হিসেবে আমরা একই পরিবারের সদস্য। এই উপমহাদেশের শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও সমগ্র মানবতার স্বার্থে আমরা এক হয়েছি'।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) জানায়, দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান,মালদ্বীপ ও ভারতের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এই ভিডিও কনফারেন্সে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৮ই এপ্রিল ফার্মগেটস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সাইক ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (এসআইএমটি) আয়োজিত 'জব রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড সেলিব্রেশন ২০১৭' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দক্ষ জনশক্তি পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বিশ্বব্যাপী কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশকে উন্নত ও বেকারমুক্ত করতে হবে। এলক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উচ্চশিক্ষা উন্নয়নে ভারত ও বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারত সরকারের পক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ৭-১০ই এপ্রিল ভারত সফরকালীন দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়। স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. স্বপন কুমার দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

সৃজনশীল বই পড়ার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৩শে এপ্রিল বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস উপলক্ষে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'সেকায়েপ প্রকল্পের পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের যুগোপযোগী এবং ভালো মানের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পৃথিবীর সেরা সাহিত্য, ভ্রমণ এবং কল্পকাহিনির বই পড়ার আহ্বান জানান। বর্তমানে সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের ২৫০টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি উপজেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কর্মসূচি চালু করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৮ই এপ্রিল ২০১৭ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে সাইক ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি আয়োজিত 'জব রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড সেলিব্রেশন' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার প্রদানের নীতিমালা চূড়ান্ত

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে দেশজুড়ে চালু হচ্ছে 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'। ২০১১ সালে দেশের কয়েকটি জেলার ৯৩টি স্কুলে এই কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে সরকার এ কর্মসূচির কলেবর বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুপুরের খাবার পাবে। এই খাবার গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কমিউনিটি এবং শহর এলাকার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করবে।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে ১২ই এপ্রিল সচিবালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TIVET) এবং দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, এ খাতের উন্নয়নে ইইউ-এর সুনির্দিষ্ট করণীয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপন, পার্বত্য অঞ্চলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে এডুকেশন সেক্টর বাজেট সাপোর্ট প্রোগ্রামের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ খাতে ৫০ মিলিয়ন ইউরো প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সহযোগিতার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ইইউকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৬৫ ভাগ কারিগরি শিক্ষায় উন্নীত করতে কাজ করছে সরকার। এছাড়া ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনা হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে এপ্রিল ২০১৭ ভূটানের Royal Banquet Hall-এ অনুষ্ঠিত 'International Conference on Autism and Neuro Developmental Disorders'-এর উদবোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৮শে এপ্রিল সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতি আয়োজিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য শিক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ভালোভাবে লেখাপড়া করে নিজের জীবনকে সার্থক করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। জ্ঞান-প্রযুক্তি ও দক্ষতায় নিজেদের সমৃদ্ধ করতে হবে। তিনি নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরে তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি ও সনদ বিতরণ করেন।

শিক্ষকদের উন্নত মূল্যবোধ অর্জন করার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৯শে এপ্রিল হোটেল লো মেরিডিয়ানে জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক ও মাস্টার ট্রেইনারদের 'কানেক্টিং ক্লাসরুম'স শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশের জন্য কাজ করার এবং সততা, নিষ্ঠা ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে নতুন প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ ও আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরে শিক্ষামন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঝে পদক বিতরণ করেন।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান

ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে রাজকীয় আপ্যায়ন হলে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস' শীর্ষক তিনদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য 'ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস ও অন্যান্য নিউরো ডেভেলপমেন্টাল সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য কার্যকর ও টেকসই বহুমুখী কর্মসূচি'। এ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ও অটিজমে আক্রান্তদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে কার্যকর নীতি এবং কর্মসূচি গ্রহণ করতে বিশ্বের সব দেশের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের জটিলতায় আক্রান্তদের সহায়তায় রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। তিনি প্রতিবন্ধীদের বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার, মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান এবং সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটিজম আক্রান্তরা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার সুযোগের দাবিদার। শিক্ষা থেকে শুরু

করে কর্মসংস্থান সর্বক্ষেত্রেই তাদের পর্যাপ্ত সামাজিক ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

শেখ হাসিনা বলেন, ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার আক্রান্তরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা সবার ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে বাস করার অধিকার রাখে। এরা ব্যক্তি ও পরিবার থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিন্দা, বৈষম্য ও মানবাধিকার বঞ্চিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দুজন বিশেষজ্ঞ এ বৈষম্যের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবন্ধী ও অটিজম আক্রান্তদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা তার সরকারের জাতীয় কর্মসূচিতে অন্যতম অগ্রাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ২০১৬-২১-এর সপ্তম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছি। তিনি আরো বলেন, প্রথমবারের মতো জাতীয়ভিত্তিক আদমশুমারিতে প্রতিবন্ধিতা ও অটিজমের তথ্য যুক্ত হয়েছে। অটিজম সমস্যা সমাধানে অনেক আইনগত, সামাজিক ও চিকিৎসা-বিষয়ক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। **প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশে

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'স্বাস্থ্যে সিদ্ধান্তের জন্য উপাত্ত' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১লা এপ্রিল শুরু হওয়া এ সম্মেলন আয়োজন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, আইসিডিডিআরবি, ইউএসএআইডিসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাড়াও ১৯টি দেশের ২৫ জন প্রতিনিধিসহ ২৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলনে কে, কীভাবে জনসাধারণকে সেবা দিচ্ছে, সহায়তা দিচ্ছে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা এসব বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

৩৭ ব্র্যান্ডের স্টেন্টের খুচরা মূল্য নির্ধারণ

৩৭ আইটেমের স্টেন্টের (হার্টের রিং) খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এক টাকার কোনো পণ্য কিনলে তা ১ দশমিক ৫৫ গুণ বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। এভাবেই দুই ধাপে ৩৭ ব্র্যান্ডের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৩শে এপ্রিল অধিদপ্তর স্টেন্ট আমদানিকারকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, রাষ্ট্রীয় বিধি অনুযায়ী স্টেন্টের দাম ঠিক করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতিটি স্টেন্টের মোড়কে এমআরপি, নিবন্ধন নম্বর ও মেয়াদ লেখা থাকতে হবে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাসপাতালে স্টেন্টের মূল্যে ব্যাপক পার্থক্য এবং এর ফলে সৃষ্ট নৈরাজ্য ঠেকাতে সরকার মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফি নির্ধারণে কমিটি গঠনের নির্দেশ

বেসরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফি নির্ধারণসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে সুপারিশ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ১২ই এপ্রিল বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মালিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। মানহীন ও অবৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিক চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠনের নির্দেশ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণের কথা বিবেচনা করে সহনীয় মাত্রার মধ্যে ফি নির্ধারণে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

আধুনিক হচ্ছে ওষুধের দোকান

ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি বন্ধ এবং ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সারাদেশের ওষুধের দোকানগুলো আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর । এরই মধ্যে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরের ৭৪টি ওষুধের দোকানকে 'মডেল ফার্মেসি' এবং ৩২টি দোকানকে 'মডেল মেডিসিন শপ' ঘোষণা করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ২৫ হাজার নিবন্ধিত ওষুধের দোকান আছে। প্রায় ১৮ হাজার দোকানের কোনো ধরনের সরকারি অনুমোদন নেই। অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত, এই ১৮ হাজার ওষুধের দোকান বন্ধ করে দেবে। মডেল ফার্মেসির শর্ত পূরণ না করলে কোনো দোকানের নিবন্ধন নবায়ন করবে না। এ বিষয়ে ৪ঠা এপ্রিল একটি আদেশ জারি করেছে অধিদপ্তর।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৭ই এপ্রিল পালিত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৭। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'আসুন বিষণ্নতা নিয়ে কথা বলি'। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন, বিষণ্নতা নিয়ে বেশি কথা বলা ও আলোচনা হওয়া দরকার। এতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পথ সুগম হবে। আত্মহত্যার ঝুঁকি কমবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ৭ই এপ্রিল ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

চোখের কৃত্রিম লেন্সের খুচরা মূল্য নির্ধারণ

চোখের কৃত্রিম লেন্সের এমআরপি ঠিক করে দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। ২৭শে এপ্রিল অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সভায় ১১টি ব্র্যান্ডের লেন্সের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, বিদেশ থেকে আমদানি করা ১১টি ব্র্যান্ডের লেন্সের এমআরপি ঠিক হয়েছে। বিভিন্ন দেশে তৈরি এসব লেন্সের গুণ ও মানেও ভিন্নতা রয়েছে, তাই এমআরপিতেও পার্থক্য আছে। ১ হাজার ১২৫ টাকায় লেন্স পাওয়া যাবে, আবার কেউ চাইলে ১৪ হাজার ৬০০ টাকায় অন্য লেন্স কিনতে পারবেন।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাগতম বাংলা নববর্ষ ১৪২৪

প্রতিবছরের মতোই রমনার বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতি সংগীতানুষ্ঠান দিয়ে সূচনা হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের। এবার অর্ধশত বছর পূর্ণ হয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই এপ্রিল ২০১৭ গণভবনে বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন – পিআইডি

এ অনুষ্ঠানের। ছায়ানটের অনুষ্ঠান ছাড়াও শিশুপার্কের সামনে নারকেল বিথী চত্বরে হয় ফকির আলমগীরের ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর লোক ও গণ সংগীতের ৩৪ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান।

বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য অনুষঙ্গ বিশ্ব ঐতিহ্যের মঙ্গল শোভাযাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করে হোটেল রুপসী বাংলার সামনে দিয়ে টিএসসির মোড় হয়ে চারুকলার সামনে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং শেষভাগে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

২৮ বছর ধরে বের হচ্ছে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। এ বছরের শোভাযাত্রায় স্লোগান, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর'। এর সাথে মিল রেখে করা হয় বড়ো সূর্যের প্রতিকৃতি। একই রকম ছোটো ছোটো সূর্য সবার হাতে হাতে। সূর্যের পেছনের অংশ কালো রং। এই কালো রংকে জঙ্গিবাদ বোঝানো হয়েছে। জঙ্গিবাদ যে আমাদেরকে অন্ধকারে নিয়ে যেতে চায় তা থেকে আলোর দিকে মুখ ঘোরাতে বলাটাই এবারের মূল আহ্বান।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ১৩ই এপ্রিল ২০১৭ মানিক মিয়া এভিনিউতে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'আল্পনায় বাংলাদেশ ১৪২৩'-এর উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

আলপনায় বর্ষবরণ

আলপনা আমাদের ঐতিহ্য। এই আলপনার মধ্যে মানুষ যুগ যুগ ধরে ফুটিয়ে তুলেছে মনের আকুতি ও বাংলার রূপ। তুলির আঁচড়ে নববর্ষকে বরণ করতে সেই আলপনা আঁকার অনুষ্ঠানে অংশ নেয় তিন শতাধিক শিল্পি ও অসংখ্য মানুষ। তারা রঙে রঙে বাংলার প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলেন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে । বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ১৩ই এপ্রিল রাতে 'আলপনায় বাংলাদেশ' শিরোনামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এর উদ্‌বোধন করেন। যৌথভাবে এটির আয়োজন করে এশিয়াটিক এক্সপি, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পাহাড়ে প্রাণের উৎসব

নদীতে জলদেবীর উদ্দেশে কলাপাতায় ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ষবরণের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান শুরু হয় ১২ই এপ্রিল থেকে। তিনদিনের এ উৎসবকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। যেমন-চাকমারা বিজু, ত্রিপুরারা বৈসুক, মারমারা সাংগ্রাই, তঞ্চঙ্গ্যারা বিষু, ম্রোও খুমিরা চাংক্রান। তবে সমতলের লোকদের কাছে এ উৎসব বৈসাবি নামে পরিচিত। পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের এতিহ্যবাহী এ সামাজিক উৎসবটি শুধু আনন্দের নয় সাংস্কৃতিক কৃষ্টি, ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধনের প্রতীক।

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস ছিল ২৯শে এপ্রিল । দেশের বিভিন্ন নৃত্য সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করে। মঙ্গল নৃত্য আনন্দ শোভাযাত্রা, সম্মাননা স্মারক প্রদানসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২৩শে এপ্রিল সপ্তাহব্যাপী যৌথ ভাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও নৃত্যশিল্পী সংস্থা এ দিবসটি পালন করে। শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মিলনায়তনে ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা, নৃত্য ও সম্মাননা অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী

বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংগঠন ফ্রেন্ডশিপের আয়োজনে ১৯শে এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস। এ দিবসটি উপলক্ষে ঢাকায় লালবাগ কেল্লায় এক ব্যতিক্রমী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এখানে নৌকা প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছিল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর প্রদর্শনীস্থল ঘুরে দেখেন।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল সেবায় স্বচ্ছতা বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি ডিজিটাল সেবা ছড়িয়ে দিতে নীরব বিপ্লব করেছে। ডিজিটাল সেবায় হয়রানি কমার পাশাপাশি সরকারি দপ্তরগুলোর কাজে আগের চেয়ে বেড়েছে স্বচ্ছতা। সময় ও অর্থ ব্যয় কমেছে। ডিজিটাল সেবায় অনেক কৃষকের জীবন পরিবর্তন হয়েছে। এ ধরনের খবরের গুরুত্ব তুলে ধরতে ১৩ই এপ্রিল প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' শিরোনামে। সভায় বক্তারা বলেন, এ সেবার মাধ্যমে সরকারি সেবা পেতে আগের চেয়ে ৫৮ শতাংশ কম সময় লাগছে। ৩০ শতাংশ অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে আর ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে সরকারি অফিসে ঘোরাঘুরি কমেছে।

পিপলস চয়েজ পুরস্কার পেল বাংলাদেশ

মাইক্রোসফট ইমাজিন কাপ ২০১৭-এর ১৫তম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক পর্বে 'পিপলস চয়েজ' পুরস্কার পেল বাংলাদেশ। টিম প্যারাসিটিকা নামক এ দলের সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তৌহিদুল ইসলাম, সৈয়দ নাকিব হোসেন ও ফজলে রাব্বি। ২৫শে এপ্রিল ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পর্বে বেশি ভোট পেয়ে বাংলাদেশের দলটি এই পুরস্কার পায়। টিম প্যারাসিটিকা 'ফাস্টনোসিস' নামে একটি স্মার্টফোন অ্যাপ তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী সহজেই যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো পরজীবী রোগের লক্ষণ জানতে পারবে।

ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে দ্বিতীয় ঢাকা

ফেসবুক ব্যবহারকারী হিসেবে ঢাকা এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চল মিলে ২ কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষ সক্রিয়ভাবে ফেসবুক ব্যবহার করছে। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত 'উই আর সোশ্যাল লিমিটেড' ও কানাডার 'হুটস্যুট ইনকরপোরেশন'- এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। প্রতিষ্ঠান দুটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ক গবেষণা ও ডিজিটাল সেবাদাতা হিসেবে পরিচিত।

সিটি আইটি কম্পিউটার মেলার প্রদর্শন

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিসিএস কম্পিউটার সিটির বার্ষিক 'সিটি আইটি ২০১৭ কম্পিউটার মেলা' শুরু হয় ৬ই এপ্রিল। ৮ দিনব্যাপী চলে এই মেলা। এই মেলায় এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ভার্চুয়াল রিয়ালিটির (ভিআর) ওপর। মেলায় ছিল গেমিং জোন, ভিআর ও ত্রিমাত্রিক (থ্রিডি) প্রদর্শনী, ফটোবুথ এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। ১৩ই এপ্রিল শেষ হয় এ মেলা। এ মেলা আয়োজনে সহযোগিতা করেছে এইচপি, আসুস, এসার, ডেল লেনোভো ও র‍্যাপো।

বড়ো আকারের ডেটা সেন্টার গড়তে যাচ্ছে সরকার

বড়ো আকারের ডেটা বা তথ্য ব্যাংক সাইবার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের ডেটা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য আগাম ঝুঁকি নির্ণয়েও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ঢাকায় বড়ো আকারের ডেটা সেন্টার করতে যাচ্ছে সরকার, যা বিশ্বে ষষ্ঠ ডেটা ব্যাংক হবে। এর 'ব্যাকআপ মেটারেজ' থাকবে যশোরে। ২৫শে এপ্রিল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে 'দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ভবনে অনুষ্ঠিত হয় 'সাইবার নিরাপত্তা: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার। এ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্তি সচিব মো. হারুনুর রশিদ এসব তথ্য জানান। **প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফফাত আখি**

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষির জন্য নতুন ৫টি অ্যাপ তৈরি

কৃষিকাজে সহায়তা করবে এমন পাঁচটি নতুন মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) উদ্‌বোধন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। অ্যাপগুলো হচ্ছে– ক্রপ প্রোডাকশন(ফসল উৎপাদন রিপোর্ট), ডিএই অফিস ডিরেক্টরি, স্যালাইনিটি ইনফরমেশন সিস্টেম (লবণাক্ততার তথ্য), অর্গানিক ফারমিং (প্রাকৃতিক চাষাবাদ) এবং ওয়েদার ফোরকাস্টিং (আবহাওয়ার পূর্বাভাস)।

গত ২৩শে এপ্রিল উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জাপান সরকারের অনুদানে এশিয়া-প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটির এ ধরনের প্রকল্প বাংলাদেশে এই প্রথম। কেডিডিআই ফাইন্ডেশন, বিটিআরসি ও ইএটিএল যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

ক্রপ প্রোডাকশন অ্যাপ থেকে নির্দিষ্ট এলাকার ফসলের জন্য প্রতিবেদন দেখা যায় এবং তৈরি করা যায়। ডিএই অফিস ডিরেক্টরি অ্যাপে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সব কর্মচারীর তথ্য ও প্রয়োজনে তাদের ফোন করার সুবিধা আছে। অর্গানিক ফারমিং অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক ঘরে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে চাষাবাদ বিষয়ক তথ্য, নিয়মাবলি ও সার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। স্যালাইনিটি ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যাপে জমিনে লবণের পরিমান এবং কোন ফসলের উৎপাদন ভালো হবে তা জানা যাবে। ওয়েদার ফোরকাস্ট অ্যাপটি থেকে যে-কোনো মুহূর্তের আবহাওয়ার তথ্য জানা যাবে এবং পরবর্তী পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসও পাওয়া যাবে।

পাটের নতুন চারটি জাত আবিষ্কার

সোনালি আঁশের স্বর্ণালি যুগ ফিরিয়ে আনতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন পাট বিজ্ঞানীরা । সম্প্রতি পাট বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন পাটের আরও নতুন চারটি জাত। এ জাতগুলো হলো– বিজেআরআই তোষা পাট-৭, বিজেআরআই দেশি পাট-৯, বিজেআরআই মেস্তা-৩ এবং বিজেআরআই কেনাফ-৪। উচ্চফলনশীল, খরাসহিষ্ণু, স্বল্পমেয়াদি ও রোগ প্রতিরোধী এ জাতগুলো চাষ করলে একদিকে কৃষক যেমন লাভবান হবেন, অন্যদিকে নতুন আবিষ্কৃত এ জাতগুলো দেশকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে। গত ৫ই এপ্রিল কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৯২ তম এনএসবি সভায় সারাদেশে পাটের এ জাতগুলো চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানানো হয়।

আসছে ফরমালিনের ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভ

বিভিন্ন ফলফলাদি, শাক-সবজি ও মাছসহ কাঁচা উপাদান দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় বিষাক্ত ফরমালিন। এই বিষাক্ত ফরমালিনের বিকল্প হিসেবে ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভ নামে নতুন একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) বিজ্ঞানীরা। আর এই তরল পদার্থের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে চা পাতার সবজি ও বিভিন্ন ফলের খোসা।

ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভ তৈরিতে বিসিএসআইআরের খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. জহুরুল হকের নেতৃত্বে কাজ করেন একদল বিজ্ঞানী । ২০১৪ সাল থেকে গবেষণা করে এ পর্যন্ত গবেষণা কাজে প্রাথমিক সফলতা পেয়েছেন তারা। আগামী ছয় মাসের মধ্যে তা বাজারে আসবে বলে জানিয়েছেন ড. জহুরুল হক। এটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব, এর উৎপাদন পদ্ধতি সহজ, খরচ কম এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

জাবাটিকাবা

কাঁচাপাকা জাবাটিকা ফল

জাবাটিকাবা একটি বিদেশি জাতের ফল। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Plinia Cauliflora. এর জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের সাওপাওলো প্রদেশে, যাকে Brazilian Grapetree বলা হয়ে থাকে। তবে ফলটি প্রায় পুরো দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু, প্যারাগুয়েতে উৎপাদন হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু, অনেক পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগী, অসময়ে ফলদানকারী একটি ফল অর্থাৎ কলা, পেঁপে, নারিকেল, সফেদা, লেবু ব্যাতিরেকে এই সময়ে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ফল থাকে না। এর ফুল ধরা শুরু হয় ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাসে এবং পরিপক্ক হয় মার্চ মাসে। যখন জলপাই, কুল বা বরই, তেঁতুল শেষ হয় তখন মার্চ মাসে এ ফল পাওয়া যায়। মধুমাসে আম, লিচু, আনারস, লটকন আসার আগে হতে পারে জাবাটিকাবা একটি উত্তম ফল। কিছুটা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত কাঁটাযুক্ত গাছ, মার্বেল আকারের ফল পানিয়ালের মতো দেখতে। আকার লটকন কিংবা পানিয়ালের মতো হলেও খেতে কালো আঙুরের বা লিচুর মতো। ফলটির ঘন কালো চামড়া এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, অ্যাজমা প্রতিরোধ করে, ডায়রিয়া উপশম করে। জাবাটিকাবা ফলে অধিক প্রোটিন থাকে, নিয়মিত খেলে শরীরের চামড়া টানটান থাকে, প্রাকৃতিকভাবে চুল পড়া বন্ধ করে এবং অ্যান্থোসায়ানিন নামক এন্টিক্যানসার উপাদান থাকে। এটি দ্বারা জ্যাম, জেলি, উঁচুমানের জুস তৈরি করা যায়। প্রতিটি ফলে বীজ থাকে ২টি থেকে ৩টি এবং বীজগুলো পলিএমব্রায়োনিক বা বহুভ্রুণী। চারা রোপণের ৪-৫ বছরের মাথায় ফল আসে। গাছের উচ্চতা সাধারণত ১২-১৫ ফুট হয়, তবে বয়স্ক গাছ ৪৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং গাছ ঝোপালো প্রকৃতির। গাছের গোড়া থেকে প্রত্যেকটি কাণ্ডেই প্রচুর সংখ্যক ফল ধরে, যেমনটি বাংলাদেশে লটকন গাছে লটকন ফল ধরে। বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে এর জার্মপ্লাজম বা মাতৃবাগান আছে যেখান থেকে প্রতিবছর চারা উৎপাদন। হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুরের উদ্যানতত্ত্ববিদ কৃষিবিদ মো. মতিউল আলম বলেন, বহুবর্ষজীবী এই ফলে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, সুগার ও ভিটামিন আছে যা মানবদেহের পুষ্টি ঘাটতি পূরণে সক্ষম এবং বাংলাদেশে এই ফল চাষ ও সম্প্রসারণে অপার সম্ভাবনা আছে। আবার কোনো কোনো দেশে বিশেষ করে তাইওয়ানে ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাবাটিকাবা গাছের বনসাই খুবই জনপ্রিয়। হার্টিকালচার সেন্টারগুলে তে বছরে ১৬০০টি চারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সুলভমূল্যে অর্থাৎ মাত্র ১৫ টাকা প্রতি চারা দরে জনগণের মাঝে বিক্রয় করা হয়।

প্রতিবেদন : মো. জাহিদ হোসেন চৌ.

নতুন জৈবিক বালাইনাশক আবিষ্কার

'ট্রাইকোডার্মা' নামে নতুন এক ধরনের বায়োপেস্টিসাইড বা জৈবিক বালাইনাশক আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বাহাদুর মিয়া। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমে আসবে এবং উৎপাদন দ্বিগুণ হবে এই বালাইনাশক ব্যবহারে। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা পাবে।

আরডিএ সূত্র জানায়, 'ট্রাইকোডার্মা ' হচ্ছে মাটিতে মুক্তভাবে বসবাসকারী উপকারী ছত্রাক, যা উদ্ভিদের শিকড়স্থ মাটি, পচা আবর্জনা, কম্পোস্ট ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এটি মাটিতে বসবাসকারী উদ্ভিদের ক্ষতিকর জীবাণু অর্থাৎ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোডকে মেরে ফেলে। ট্রাইকোডার্মা প্রকৃতি থেকে আহরিত এমনই একটি অনুজীব যা জৈবিক পদ্ধতিতে উদ্ভিদের রোগ দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। মরিচের বৃদ্ধি ও ফলনে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের মাটিবাহিত রোগ যেমন– শিকড় ও কাণ্ড পচা, পাতা ঝলসানো ও দাগপড়া রোগ দমনে ট্রাইকোডার্মা বিশেষ ভূমিকা রাখে। **প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় ৩৬ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় ৩৬ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (বিপিএসসি) সুপারিশ অনুযায়ী এ নিয়োগ দেওয়া হয়। সম্প্রতি এনবিআর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। যোগদান করার পর শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমিতে এক বছর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ, দুই বছর শিক্ষানবিশ গ্রহণ করবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় নিয়োগ পাওয়া ৩৬ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা।

পাহাড়ে বৈসাবি উৎসব

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকজন শহরের গর্জনতলী এলাকায় গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে বৈসাবি উৎসবের সূচনা করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী

খাগড়াছড়িতে ১২ই এপ্রিল ফুল বিজু উৎসবে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ

দীপংকর তালুকদার ১২ই এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের বৈসাবি উৎসব উদ্‌বোধন করেন। ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পাহাড়ে বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া খাগড়াছড়িতে ফুল বিজু উৎসবে দেবতাদের উদ্দেশে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দেয় পাহাড়ি শিশুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির বৈধ বাঙালি মালিকেরা কেউ বঞ্চিত হবে না

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহর রিজভী বলেছেন, আইন সংশোধনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে বসবাসরত জমির বৈধ বাঙালি মালিকেরা কেউই বঞ্চিত হবেন না। এটা সরকারের অঙ্গীকার। তারাই বঞ্চিত হবে যারা সেখানে অবৈধভাবে দখল করে আছে। পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধন শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পথে বড়ো বাধা। এখন ভূমি কমিশন আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। এটা হয়ে গেলে পার্বত্য জেলাগুলোর সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। রাজধানীর ইস্কাটনে ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিকাশ' শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করেছে বিআইআইএসএস।

তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিকাশে একটি নীতিমালা করতে হবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সুরক্ষিত করতে হবে। বৈচিত্র্য সমাজকে আরো শক্তিশালী করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকে মূলধারার সঙ্গে একীভূত করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা যাবে না। **প্রতিবেদন: জাকির হোসেন**

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাল্যবিবাহ, মাদক, ইভটিজিং ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে শপথ নিল শিক্ষার্থীরা

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ১৩৪ টি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহ, মাদক, ইভটিজিং ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে শপথ নিয়েছে। ১৯শে এপ্রিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল লতিফ মিয়ার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করানো হয়। শপথ পাঠ করান মাদক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য , পুলিশ, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষকগণ।

জানা যায়, ওসি আবদুল লতিফ উপজেলাকে মাদক, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্যে পাঁচটি ইউনিয়নের ৪৫ টি ওয়ার্ডে সভা করেছেন। এসব সভায় জনপ্রতিনিধি, ইমাম, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে যুক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে থেকে ২৫০০ জনকে নিয়ে ৫০টি মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি করা হয়। এসব কমিটির সদস্যরা মাদক ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে এলাকার মানুষকে সচেতন করার কাজ করছেন। এরই অংশ হিসেবে এদিন উপজেলার ১৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীকে শপথ পাঠ করানো হয়। ৫৫ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে এ শপথ অনুষ্ঠান হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানসহ এলাকাবাসী ওসির এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

রানা প্লাজায় বাবা-মা হারা ৪৪শিশু বড়ো হচ্ছে অরকা হোমসে

২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজায় ঘটে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা । ধসে পড়ে পুরো ভবন। ভবনে চাপা পড়ে নিহত হন ১১৭৫ জন নারী-পুরুষ। দুই হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন। এছাড়া নিখোঁজ হন অনেকে। এ দুর্ঘটনায় অনেক শিশু হারিয়েছে তাদের মা-বাবাকে। মা-বাবা হারা এসব শিশুর ৪৪ জনের ঠাঁই হয়েছে গাইবান্ধার ফুলছড়িতে স্থাপিত 'অরকা হোমস' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে। সেখানে লেখাপড়া , খেলাধুলা, বিনোদন ও মাতৃস্নেহে বেড়ে উঠছে তারা। ওল্ড রাজশাহী ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশন ২০১৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর ফুলছড়ি উপজেলার কাঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামে অরকা হোমস প্রতিষ্ঠা করে। তাদের সহায়তা করছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।

১৩ বছরেই পাকা রাঁধুনি আফনান

মাত্র ১৩ বছর বয়সেই রান্নাবান্নায় মার্কিনিদের রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোর আফনান আহমেদ। হয়ে উঠেছে পাকা রাঁধুনি। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা সিটির বাসিন্দা আফনান সম্প্রতি অংশ নেয়

রান্নায় মগ্ন প্রবাসী বাংলাদেশি কিশোর আফনান আহমেদ

মাস্টার সেফ জুনিয়র প্রতিযোগিতার পঞ্চম আসরে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে শুরু হওয়া এ আয়োজনের চূড়ান্ত রাউন্ডে সেরা ২০-এ থাকা আফনান দখল করেছে ৮ম স্থান। আটলান্টা সিটির ইউনিয়ন গ্রোব সিডল স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আফনান। তার বাবার বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে। এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় যুক্তরাষ্ট্রের নয় থেকে ১৩ বছর বয়সি পাঁচ হাজার শিশু-কিশোর। তাদের মধ্য থেকে সেরা ৮ম স্থান দখল করে আফনান।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

লিঙ্গ অসমতা দূরীকরণে সবচেয়ে সফল বাংলাদেশ

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে লিঙ্গ অসমতা দূর করতে সবচেয়ে ভালো সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ৩রা এপ্রিল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ভারতের শিশু অধিকারকর্মী কৈলাস সত্যার্থী এ মন্তব্য করেন।

নারী ও শিশুদের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আগে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল–এনজিওগুলো শুধু শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে।

জামানত ছাড়া ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবে নারী উদ্যোক্তারা

নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ পাওয়া সহজ করতে জামানত ছাড়াই ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এপ্রিলে জারি করা এ প্রজ্ঞাপনে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক জামানতবিহীন ১০ লাখ টাকা ঋণ প্রদানের নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোকে । তবে সব অর্থায়নই হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায়। এসব ঋণে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ।

অটিজম বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন সায়মা ওয়াজেদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত করেছে। ২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবস পালন উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে ডব্লিউএইচও'র দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণায় বলা হয়, সায়মা ওয়াজেদ জাতীয় নীতিমালা ও কৌশল বিষয়ে প্রচারণার জন্য এ অঞ্চলের ১১টি সদস্যদেশের সঙ্গে অ্যাডভোকেসিতে সহায়তা দেবেন। এজন্য তাকে অটিজমের জন্য একজন শক্তিশালী প্রচারক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সায়মা ওয়াজেদ অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বিষয়ক বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারপারসন।

ফোর্বসের তরুণ উদ্যোক্তার তালিকায় নাজবিন

বিশ্বখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ম্যাগাজিন *ফোর্বস*-এর তৈরি এশিয়ার সেরা তরুণ সামাজিক উদ্যোক্তার তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের সওগাত নাজবিন খান। সম্প্রতি এশিয়ার ৩০ বছরের কম বয়সি ৩০ জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে এ তালিকা প্রকাশ করে *ফোর্বস*।

২৭ বছর বয়সি নাজবিন গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রচলনের জন্য গড়ে তুলেছেন এইচএ ফাউন্ডেশন। এইচএ ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্কুলে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই, ইউনিফর্ম, পরিবহণ সুবিধা পাচ্ছে। তারা মাল্টিমিডিয়া নির্ভর ক্লাসরুমের পাশাপাশি ল্যাপটপ, ট্যাবের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এর আগে নাজবিন 'কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ২০১৬', 'এশিয়া ইয়ং পারসন অব দ্য ইয়ার ২০১৬' এবং 'গ্রিন ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৫' লাভ করেন।

কমনওয়েলথ দিবসে লন্ডনে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিচ্ছেন ময়মনসিংহের মেয়ে সওগাত নাজবিন খান

প্রথমবারের মতো ডাকের গাড়ির চালক নারী

দেশে এই প্রথমবারের মতো ডাকের ভারী গাড়ির চালকের আসনে বসতে যাচ্ছেন নারীরা। ৯ই এপ্রিল ঢাকার ডাক ভবন চত্বরে এক অনুষ্ঠানে ১০ জন নারী চালকের হাতে ১০টি মেইল গাড়ির চাবি তুলে দেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। নারী চালক নিয়োগের বিষয়টিকে ডাক বিভাগের জন্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অধীনে নতুন যোগ হতে যাওয়া ১১৮টি যানবাহনের মধ্যে ২০ শতাংশ চালক থাকবেন নারী।

২১ নারী পুলিশ পেলেন কর্মদক্ষতা পুরস্কার

কর্মকুশলতা ও পেশাদারিত্বে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ নারী পুলিশ 'বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন অ্যাওয়ার্ড-২০১৭' পেয়েছেন। ২০শে এপ্রিল মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজ কনভেনশন হলে এ পুরস্কার তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

গালর্স ইন আইসিটি ডে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় ও পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) প্রতিবছর এপ্রিলের চতুর্থ বৃহস্পতিবার পালন করে 'গার্লস ইন আইসিটি ডে'। তবে বাংলাদেশে এর ব্যাপ্তি আরো বেশি ছড়িয়ে দিয়ে এ বছর কার্যক্রমটি মাসজুড়ে আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০শে এপ্রিল দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে মাসব্যাপী এ আয়োজনের উদ্‌বোধন করা হয়।

ব্রাজিল নারী ফুটবলে প্রথম নারী কোচ

ব্রাজিল নারী ফুটবল দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন এমিলি লিমা। এই প্রথম ব্রাজিল নারী ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব পেলেন কোনো নারী। কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে যে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে তাঁর দল সবকটিতেই জয় পেয়েছে। এ সাফল্যে খুবই উজ্জীবিত এই নারী কোচ।

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক নারীর মৃত্যু

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্কতম নারী এমা মোরানো ১৫ই এপ্রিল ১১৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। বিবিসি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তিনটি শতাব্দী দেখা ইতালীয় এই নারী ইতালির পিয়েদমন্ত এলাকায় ১৮৯৯ সালের ২৯শে নভেম্বর জন্ম নেন। দলিলপত্র অনুযায়ী, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া বিশ্বের শেষ জীবিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

প্রতিদিনের রান্নায় ব্যবহৃত মসলার পুষ্টি ও ঔষধি গুণ

আমাদের প্রতিদিনের খাবার তৈরীতে নানা রকম মসলা ব্যবহার করা হয়। রান্নায় ব্যবহৃত মসলায় রয়েছে নানা ঔষধি ও পুষ্টি গুণ, যা শরীরের জন্য উপকারী। কিছু মসলার গুণাগুণ ও উপকারিতা এখানে তুলে ধরা হলো :

আদা: আদার সংস্কৃত নাম আদ্রক। বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। মসলা হিসেবে আদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আদার মাংস নরম ও সুস্বাদু হয়। বদ হজমজনিত পেট ব্যথায় পরিমিত আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে খেলে দ্রুত পেট ব্যথার উপশম হয়। আদা রুচি ও খিদে বাড়ায়। সর্দি ও হাঁপানিতে আদার রসের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে দ্রুত উপশম হয়। কাঁচা আদা চিবিয়ে খেলে দাঁত ব্যথা, টনসিলের ব্যথা ও স্বরভঙ্গ ভালো হয়।

রসুন: রান্নায় অপরিহার্য বহুগুণ সমৃদ্ধ এক উপকারী মসলা হলো রসুন। রসুনে মিষ্ট, নোনতা, তিক্ত, কষ্টি ও কটু- এই পাঁচটি রস বিদ্যমান, কোনো দ্রব্যে আয়ুর্বেদ মতে ছয়টি রস থাকে, একটি রস কম (উন) আছে তাই এর নাম 'রসুন' হয়েছে বলে প্রচলিত। রসুন ঔষধিগুণে সমৃদ্ধ এক উপকারী মসলা। নিয়মিত রসুন খেলে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। রসুনে রয়েছে ভিটামিন-এ, বি, সি, ডি, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ এবং আয়োডিন। তাছাড়া জীবাণুনাশক অ্যাক্রোলিন, ক্রোটেনিক তৈল, সালফারযুক্ত অ্যাসাইনো এসিড। রসুনের মধ্যে থাকা এলাইল সালফাইড ব্লাড প্রেসার বা রক্ত চাপ বৃদ্ধি করে। ব্রেস্ট ক্যানসারসহ অন্যান্য প্রাণঘাতী ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

নিয়ম করে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ রসুন খেলে মাথা ঘোরা, অজীর্ণ, সর্দি, হাঁপানি, যক্ষ্মা, কোস্টবদ্ধতা বহুমূত্র, বাত, ঋতুর গোলযোগ, উদরাময় প্রভৃতি রোগে উপকার পাওয়া যায়। রসুনের রস নিয়মিত মাথায় দিলে চুল পড়ে না। হাড়ভাঙা সারাতে, ত্বক উজ্জ্বল করতে, দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে ও মেদ কমাতে রসুন সাহায্য করে।

পেঁয়াজ: রান্নায় পেঁয়াজের ব্যবহার খাবারের স্বাদকে বাড়িয়ে দেয়। হার্ট ভালো রাখতে, বাতের ব্যথা দূর করতে এবং ঠান্ডা লাগার প্রবণতা দূর করতে পেঁয়াজ ভালো কাজ করে। দেহের অস্বস্তিকর অবস্থা, ঝিমানো ভাব, স্নায়ুবিক দুর্বলতা এবং বদহজমে পেয়াজ অনেক উপকারী। পেঁয়াজ কোলেস্টেরল কমায় ও রক্ত জমাট বাঁধা দূর করে।

মরিচ: রান্নায় ব্যবহৃত অন্যতম উপাদান বা মসলা মরিচ। এটি ঝালযুক্ত, কাঁচা ও শুকনা উভয় প্রকার মরিচই রান্নায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচা মরিচে ভিটামিন সি বেশি রয়েছে। শুকনো মরিচ উদ্দীপক হলেও রক্ত সংবাহনতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের কার্যক্রিয়ায় ভালো কাজ করে।

গোল মরিচ: বিশেষ বিশেষ রান্নার স্বাদ ও সুগন্ধি বাড়াতে গোল মরিচ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পিপার নিগ্রাস উদ্ভিদের শুকনো ফলই হলো এই গোল মরিচ। কাশি হলে গোল মরিচের গুঁড়োর সঙ্গে মরিচ মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

হলুদ: হলুদও রান্নার অপরিহার্য একটি মসল্লা। হলুদে রয়েছে নানা ঔষধি গুণ। এক চামচ করে হলুদের রস মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে লিভারের দোষ সেরে যায়। কোনো কারণে গলা বসে গেলে ০২ গ্রাম হলুদের গুঁড়ো ১ গ্রাম সামান্য গরম পানি ও সামান্য চিনি মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত কিছুদিন হলুদ ভেজানো মসুর ডাল এক সঙ্গে বেটে দুধের মধ্যে দিয়ে মুখে মাখলে লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

ধনে : ধনে গুঁড়া রান্নায় আবশ্যকীয় এক মসলা, রান্না সুস্বাদু করে। ধনেতে রয়েছে নানা ঔষধি গুণ। ধনে পেটের ব্যথা দূর করে ও খাবার হজমে সাহায্য করে।

কালিজিরা : কালিজিরা বদহজম, পেটের অসুখ দূর করে, বাত, কৃমি, কফে উপকারী। গরম পানিতে কালিজিরা দিয়ে কুলি করলে দাঁতের ব্যথা দূর হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলে গেলে কালিজিরা তৈল লাগালে ভালো হয়।

মেথি: মেথি একটি ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ মসলা। প্রতিদিন সকালে মেথি গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে খেলে ডায়াবেটিসের শর্করা কমে যায়। মেথি ম্যালেরিয়া, জ্বর, জন্ডিস, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়াসহ নানা রকম অসুখ সারাতে সাহায্য করে।

লবঙ্গ: লবঙ্গ বায়ুনাশক ও এন্টিসেপ্টিক। সর্দিকাশিতে ও টনসিলের প্রদাহে অত্যন্ত উপকারী।

দারুচিনি: দারুচিনি পেট ফাঁপায় উপকারী। সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। হার্টের জন্যও দারুচিনি উপকারী। হজম শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে থাকে।

তেজপাতা: তেজপাতা খাবারের কটু গন্ধ দূর করে খাবারকে সুস্বাদু করে। সর্দি জ্বরে তেজপাতা চা পাতার সঙ্গে মিশিয়ে চা তৈরি করে পান করলে উপকার পাওয়া যায়।

এলাচি: বড়ো এলাচ হার্ট, পাকস্থলী, দাঁতের মাড়ি সবল করে। বমি বমি ভাব হলে বড়ো এলাচির দানা ভেজে খেলে উপকার পাওয়া যায়। ছোট এলাচি অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, অন্ত্রের খিঁচুনি ও হার্টের জন্য উপকারী।

জায়ফল: জায়ফলের ব্যবহার সাধারণত খাবারের স্বাদ ও ঘ্রাণ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি পাকস্থলী ও লিভারের জন্য উপকারী।

জয়ত্রী: রান্নার এ মসলাটিও স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জয়ত্রী ব্যবহারে গ্যাস্ট্রিক আলসারের অবসান হয়।

প্রতিবেদন : আক্তার জাহান

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রান্তিক পেশাজীবীর উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ

বেদে, কুমার, জেলে, কামার, স্বর্ণকার, বাঁশ ও বেতের আসবাব প্রস্তুতকারক, মিষ্টি প্রস্তুতকারক, কাঠমিস্ত্রি, নাপিতসহ পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র পেশাজীবী মানুষকে অর্থনীতির মূলধারায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ৪৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয় ধরে এই প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৪৩ হাজার ৭৪টি পরিবারের আবাসন, প্রশিক্ষণ ও নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তা দেবে সরকার। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮০১ জন সদস্য। চলতি বছর থেকে ২০২০ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করবে সমাজকল্যাণ অধিদফতর। পরীক্ষামূলক এ প্রকল্পটি সাত বিভাগের সাত জেলার সব উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২১ হাজার ৫৩৭ পরিবারকে অনুদান দেওয়া হবে। প্রতিটি পরিবার অনুদান হিসেবে পাবে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবারগুলোর আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ৪ হাজার ৩০৭টি পরিবারের সদস্যকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের মূল কারণ খুঁজে বের করে সমূলে দারিদ্র্য উৎপাটন করার পাশাপাশি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসাই সরকারের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র পরিবারের উন্নয়নে সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

রানা প্লাজায় আহত ৪৫০ জন এখন স্বাবলম্বী

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত আঁখি বেগমের সঙ্গী এখন হুইল চেয়ার। শারীরিকভাবে আহত হলেও মনের জোর হারাননি তিনি। হুইল চেয়ারে বসেই করছেন গরু প্রতিপালন। হয়েছেন স্বাবলম্বী। আহত আরেক শ্রমিক রোকসানা খাতুন। ইচ্ছাশক্তির জোরে সামান্য পুঁজিতেই পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তিনিও হয়েছেন সফল ব্যবসায়ী। আহত শ্রমিক মোতালেব হাওলাদার প্রথমে মুদির দোকান ও পরে দোকানের পাশেই ছোট্ট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন। হার না মেনে অন্ধকার সময়গুলো পেছনে ফেলে সফল হয়ে উঠেছেন তারা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সাল থেকে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা প্রশিক্ষণ শেষে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে প্রত্যেককে ৯০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অঙ্গ সংযোজনের মাধ্যমে আহত শ্রমিকদের সেলাই দক্ষতা বিউটিফিকেশন কোর্স, পশুপালনের দক্ষতা ও বিভিন্ন দোকানের বিক্রয়কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ, ভারত, ও নেপালের মধ্যে যান চলাচল চুক্তি সম্পাদিত

ভুটানের জন্য আটকে থাকা চার দেশীয় মোটরযান চুক্তি অবশেষে সম্পাদিত হলো। এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে যান চলাচল শুরু হবে।

ভুটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কানেক্টিভিটির গুরুত্বকে স্বীকার করে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের পরিবহণমন্ত্রীরা ২০১৫ সালের ১৫ জুন মোটর ভেহিক্যালস অ্যাগ্রিমেন্ট ফর রেগুলেশন অব প্যাসেঞ্জার, পার্সোনাল অ্যান্ড কার্গো ভেহিকুলার ট্রাফিক বিটুইন বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেপাল (বিবিআইএন এমভিএ) সই করে।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের শতবার্ষিকীতে স্মারক ডাকটিকিট উদ্‌বোধন

রেলওয়ের হার্ডিঞ্জ ব্রিজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিটের উদ্‌বোধন করেন রেলপথমন্ত্রী মো. মজিবুল হক। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্ত্রী বলেন এটি শুধু একটি সেতু নয়। এটা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। এটি শুধু বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের মধ্যে অনন্য স্থাপত্য। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত অনেক স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, যা বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরে। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রমত্তা পদ্মা নদীর ওপর ব্রিজটি অবস্থান করছে।

রেলপথমন্ত্রী মো. মজিবুল হক ২৭শে এপ্রিল ২০১৭ রেল ভবনের সম্মেলন কক্ষে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর স্মারক ডাকটিকিট উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

রেলমন্ত্রী এ সময় ২৫ টাকা মূল্যের ২টি স্মারক ডাকটিকিট, ৫০ টাকা মূল্যমানের ১টি স্যুভেনির, ১০ টাকা মূল্যমানের ২টি উদ্‌বোধনী খাম ও ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটা কার্ড স্বাক্ষরের মাধ্যমে অবমুক্ত করেন। **প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

গতি পাচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

বিমানবন্দর সড়ক থেকে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ ও যাত্রাবাড়ি হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত 'এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে'র কাজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ৮ই এপ্রিল ২০১৭ ভারতের নয়াদিল্লিতে হায়দারাবাদ হাউজে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত রেল যোগাযোগ উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এক্সপ্রেসওয়ের বনানী পর্যন্ত কাজ আগামী বছরেই শেষ হবে। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রকল্প অনুযায়ী, ২০ কিলোমিটারের এই উড়াল সেতুর নির্মাণ ব্যয় হবে প্রায় ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর আওতায় এ প্রকল্পে সরকারের অর্থায়ন ২ হাজার ৪১৩ কোটি টাকা। বাকিটা চীন-ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চালু হলো ট্রেন ও বাস

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চালু হলো ট্রেন ব্যবস্থা। একই সঙ্গে ঢাকা-খুলনা-কলকাতা রুটে বাস সার্ভিসেরও সূচনা হয়। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে রেলপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের চুক্তি অনুযায়ী দিনাজপুরের বিরল সীমান্ত দিয়ে ডুয়েল গেজ রেলপথে পণ্য পরিবহণ শুরু হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে হায়দারাবাদ হাউসে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যাত্রার সূচনা করে খুলনা-কলকাতা রুটে দ্বিতীয় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন এই ট্রেন চালুর ফলে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, চিকিৎসা ও ভ্রমণের কাজে যাতায়াতকারীরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি দু'দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরো জোরদার হবে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

পর্যটন : বিশেষ প্রতিবেদন

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য দক্ষিণ-পূর্ব উপমহাদেশীয় জীববৈচিত্র্যের বিশাল সমৃদ্ধ বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত এবং এশিয়ান হাতি প্রজননের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এটি প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি। ২০১২ সালে এ অভয়ারণ্য জাতিসংঘের ইকুয়েটর পুরস্কার লাভ করে। অভয়ারণ্যের উল্লেখযোগ্য প্রাণী এশিয়ান হাতি ছাড়া বন্য শুকর, বানর, হনুমান, মায়া হরিণ, সাম্বার সহ ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও চার প্রজাতির উভচর প্রাণী। সাত প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৩ প্রজাতির পাখি এবং ১০৭ প্রজাতির সুসজ্জিত বৃক্ষরাজির সমন্বয়ে গঠিত চিরহরিৎ বিশাল এই বনভূমি। তবে অভয়ারণ্যের একটি প্রবেশপথের সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে ৪৬৮ প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও ৬৯১ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে এখানে। বৃক্ষের সৌন্দর্যের সমন্বয়, উঁচুনিচু পাহাড়ে সৃজিত বাগান আর বাগানে পাখিদের মিষ্টি সুরে মুখরিত অভয়ারণ্যটি। এটি হতে পারে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র ও প্রকৃতি গবেষণাগার। যা থেকে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্য মতে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ বনাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া, বাঁশখালী ও কক্সবাজার জেলার চকরিয়াসহ ৭টি সংরক্ষিত বনভূমি নিয়ে অভয়ারণ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের অধীনে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। বনাঞ্চল সুরক্ষা, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন, শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০০৩ সালে এলাকায় চুনতি ও জলদী রেঞ্জের অধীনে ৭টি বিট অফিস স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য অভয়ারণ্য এলাকায় বনপুকুর, প্রাকৃতিক গর্জন বনাঞ্চল, গয়ালমারা প্রাকৃতিক হ্রদ, বনপুকুর ফুটট্রেইল, জাঙ্গালীয়া ফুটট্রেইল, পর্যটন টাওয়ার, গোলঘর, স্টুডেন্ট ডরমিটরি, নেচার কনজারভেশন সেন্টার, গবেষণা কেন্দ্র, ইকোকটেজসহ বিভিন্ন প্রতিবেশ পর্যটন বা ইকোটুরিজম স্থাপন করা হয়। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের মাধ্যমে সহজে অভয়ারণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহ এশিয়ান হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর এবং পাখির অবাধ বিচরণ উপভোগ করা যায়। এতো কিছু থাকার পরও অভয়ারণ্যটি এখনো পর্যটন কেন্দ্রের আওতায় আনা হয়নি। শুধু প্রয়োজন পর্যটন অবকাঠামো।

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, লোহাগাড়া, চট্টগাম

চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে লোহাগাড়া উপজেলার চুনতিস্থ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অভয়ারণ্যের অবস্থান। অভয়ারণ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য রয়েছে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি। অভয়ারণ্যের সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ইসমাইল মানিক জানান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য জীববৈচিত্র্যের অপূর্ব নির্দশন ও এশিয়ান হাতির প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র। প্রজননের সময় হলে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও নেপালসহ বিভিন্ন দেশ থেকে হাতিরা এখানে চলে আসে। এখানে গত চার মাস আগেও ২/৩ টি হাতির বাচ্চা প্রসব হয়। এটিকে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্রসহ ইকোপার্কে পরিণত করার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। ইকোট্যুরিজমের কিছু বিশেষ আকর্ষণ বিশেষ করে পর্যটন অবকাঠামো তৈরি করলে এটি দেশের অন্যতম ইকোপার্কে পরিণত হবে। ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় সম্ভব হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাহবুব আলম জানান, চুনতি অভয়ারণ্যটি দক্ষিণ-পূর্ব উপমহাদেশের জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ একটি চিরহরিৎ বনাঞ্চল। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এটিকে সহজেই দেশের সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা যাবে। আধুনিক পর্যটনের সুবিধায় নিয়ে আসতে পারলে প্রকৃতি গবেষণাগারের সুবিধাসহ এখান থেকে সরকারের প্রচুর রাজস্ব আয় হবে।

প্রতিবেদন: মোহাম্মদ ইলিয়াছ

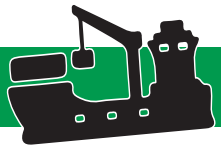

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশে গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ

কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত বিকাশের প্রতি বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সরকার গৃহীত উদ্যোগের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়লেও কৃষি খাত এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মোট জিডিপি'র ১৫ শতাংশ এবং মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশ কৃষি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন। গত ২৩শে এপ্রিল ২০১৭, রাজধানীর একটি হোটেলে 'উৎপাদনশীলতার উন্নয়নের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা এবং কৃষক সমবায় সমিতির দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ কর্মশালায় কম্বোডিয়া, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশের ২৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

রপ্তানিতে এগিয়ে গেল প্রকৌশল পণ্য

দেশে প্রথমবারের মতো রপ্তানিতে প্রকৌশল পণ্য কৃষিজাত পণ্যকে ছাড়িয়েছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) প্রকৌশল খাতে রপ্তানি হয়েছে ৫৪২.৬৪ মিলিয়ন ডলার বা ৪ হাজার

৩৪০ কোটি টাকার পণ্য। যেখানে কৃষিতে হয়েছে ৪০৯ মিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার ২৭২ কোটি টাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। ইপিবি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের প্রকৌশল পণ্য মধ্যপ্রাচ্যের আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে বাইসাইকেল অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইতালিসহ মোট ৩৩টি দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানি হওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি আরব আমিরাত, কানাডা, চীন, জার্মানিসহ প্রায় ৭৮টি দেশে যায়। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, সময়ের সঙ্গে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৌশল পণ্য রপ্তানিতে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বিষয়টি শিল্প-বাণিজ্যের জন্য ইতিবাচক।

শিল্প খাতের উন্নয়ন সহায়তায় ইউনিডো

দেশভিত্তিক কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) বাংলাদেশের চামড়া, কৃষিভিত্তিক হালকা প্রকৌশল ও অটোমোবাইল শিল্প খাতের উন্নয়নে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি শিল্পকারখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ইউনিডো সহায়তা করবে। ২রা এপ্রিল ২০১৭ ইউনিডোর এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি-দল শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সঙ্গে বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। এ সময় শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে ইউনিডোকে পাশে থাকার আহ্বান জানান। তাছাড়া ইউনিডোর প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের শিল্প খাতে সাম্প্রতিক গুণগত পরিবর্তনের প্রশংসা করে বলেন, জ্ঞানভিত্তিক শিল্প খাত বিকাশের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ নতুন এশিয়ান টাইগার

দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য 'এশিয়ান টাইগারস' নামে খ্যাত হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। কিন্তু এখন এশিয়ার অর্থনীতিতে টাইগার নামে বাংলাদেশের নাম যুক্ত হতে যাচ্ছে। 'বাংলাদেশ : দ্য নেক্সট এশিয়ান টাইগার' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যভিত্তিক খ্যাতনামা গবেষণা সংস্থা 'ক্যাপিটাল ইকোনমিকস' বলেছে, বাংলাদেশও হতে পারে এশিয়ার নতুন টাইগার। এরই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডার ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত এক নিবন্ধনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে ২০২০ সালের মধ্যে সরকার নির্ধারিত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অনুযায়ী অর্থনীতিতে ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিকস ও অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে জোর দিতে হবে। একইসাথে ক্যাপিটাল ইকোনমিকস মনে করে, এশিয়ান টাইগার হতে হলে বাংলাদেশকে অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বচ্ছ বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, গত এক দশক ধরে এশিয়ায় যে কয়েকটি দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে, তারমধ্যে বাংলাদেশ একটি; যেখানে বছরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়ে আসছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

৩৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভারী বর্ষণ

এ বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। যা গত ৩৫ বছরের মধ্যে দেশে ঘটেনি। এ অতিবৃষ্টির সঙ্গে যোগ হয়েছে পাহাড়ি ঢল ও জলাবদ্ধতা। এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে বন্যার। তাতে হয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন স্থানে জনজীবন হয়ে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অঝোরধারায় বৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব, বৃষ্টির কারণে নিম্নাঞ্চলের কৃষকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং সমতলে

ভারী বর্ষণের দৃশ্য

মেঘ নেমে আসা–এসব কিছুই ব্যতিক্রম ছিল এপ্রিল মাসে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, বিগত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে গত তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগাম বন্যা, শীতকালের মতো সমতলে কুয়াশা দেখতে পাওয়া গেছে। স্বাভাবিকের তুলনায় পুরো দেশজুড়ে দেখা যায় টানা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ও ভারী বর্ষণ।

অনুমোদিত হলো ৯৮০ কোটি টাকার জলবায়ু প্রকল্প

একনেক সভায় মোট ৩ হাজার ৬৮৪ কোটি ৫০ লাখ টাকার ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৯৮০ কোটি টাকার বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্প রয়েছে। অন্যান্য আরো ১০টি প্রকল্পের সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় এ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

চার্ট: ব্যবসা করার প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

*নিচে অবস্থান মানে বোঝাবে ভালো অবস্থান

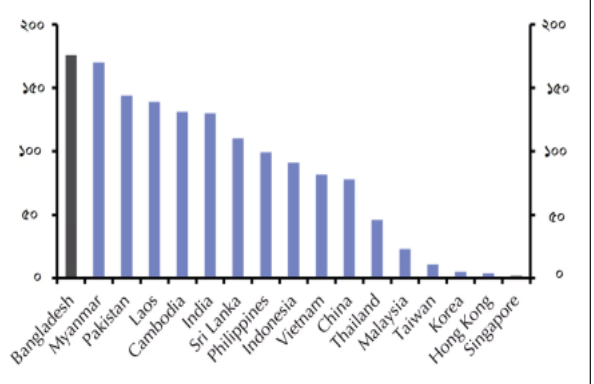

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস

বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি করার জন্য প্রতিবছর পালিত হয় বিশ্ব ধরিত্রী দিবস। ঠিক তেমনিভাবে এবারো ২২শে এপ্রিল পালিত হয় এ দিবসটি। ধরিত্রী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল–পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে সঠিক শিক্ষন বা জ্ঞান অর্জন। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

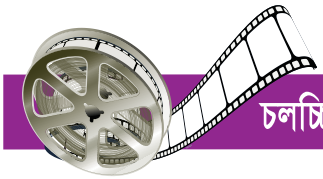

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বন্ধ হচ্ছে চলচ্চিত্রে ধর্ষণের দৃশ্য প্রদর্শন

চলচ্চিত্রে সরাসরি ধর্ষণের দৃশ্যসহ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন দৃশ্য ও প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে নতুন নীতিমালা অনুমোদন করেছে সরকার। ৩রা এপ্রিল সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭ অনুমোদন দেওয়া হয়। নীতিমালার ৬ নম্বর ধারায় ১১ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, 'চলচ্চিত্রে সরাসরি কোনো ধর্ষণ দেখানো যাবে না'। ১২ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, 'শিশু বা নারী কিংবা উভয়ের প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন কোনো ঘটনা ও দৃশ্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না'।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসে এফডিসিতে বর্ণাঢ্য আয়োজন

৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের এই দিনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন তথা আজকের 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিল' উত্থাপন করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা হয়। ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিশেষ দিনটিকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। তারপর থেকে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর এফডিসিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয়। বিশেষ এই দিনটি উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের উদ্যোগে বিএফডিসিতে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। 'আমাদের চলচ্চিত্রকে ভালোবাসুন, প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখুন' স্লোগান নিয়ে পঞ্চমবারের মতো এই দিবস পালন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ৩রা এপ্রিল ২০১৭ এফডিসিতে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে 'বর্তমান পরিবেশন ও প্রদর্শন পদ্ধতিই আমাদের চলচ্চিত্রের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সিনেমা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মিত হতে যাচ্ছে। ভারত থেকে এ ঘোষণা এসেছে। এ ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২০ সালে । ৮ই এপ্রিল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির হায়দারাবাদ হাউসে একান্ত বৈঠক করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আসেন দুই প্রধানমন্ত্রী। এ সময় নরেন্দ্র মোদি বঙ্গবন্ধুর নামে রাজধানীর একটি সড়কের নামকরণের কথা বলেন। জাতির পিতার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কাজ নিয়ে একটি চলচ্চিত্র যৌথভাবে প্রযোজনায় রাজি হয়েছি। আশা করছি, ২০২০ সালে সেটি মুক্তি পাবে'। এ সময় নরেন্দ্র মোদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র হিন্দি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২১ সালে আমরা যৌথভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্রও নির্মাণ করব। **প্রতিবেদন : মিতা খান**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৮ই এপ্রিল ২০১৭ ভারতের নয়াদিল্লিতে হায়দারাবাদ হাউজের বলরুমে হিন্দি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী-এর মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

টাইগার ক্রিকেটারদের বেতন ও ম্যাচ ফি বাড়ল

অনেক দিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় সর্বসম্মতভাবে নতুন বেতন কাঠামো অনুমোদন পায়। একই সাথে ম্যাচ ফি বৃদ্ধির বিষয়টিও চূড়ান্ত হয়। চার বছর ধরে ম্যাচ ফি বাড়ানো হয়নি । তবে ১ বছর আগে ক্রিকেটারদের বেতন বাড়ানো হয়েছিল। বিসিবির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ক্রিকেটারদের উইনিং বোনাস যথাশীঘ্রই বাড়ানোর ঘোষণা আসছে।

অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের মাসিক ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার এবং যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়ের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাসিক ভাতা প্রদান করার। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এককালীন অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সভায় ৬৩০ জন ক্রীড়াবিদকে ১৫ হাজার টাকা হারে এককালীন অনুদান প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়।

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিমালা চূড়ান্ত

সম্প্রতি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিমালা চূড়ান্তকরণ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিমালার আওতায় খেলোয়াড় হিসেবে বাংলাদেশি নাগরিকগণ জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন। দলগত খেলায় যিনি জাতীয় দলে কমপক্ষে ৫ বছর অথবা ১০টি আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, তিনিই এ পুরস্কারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন। যে-কোনো ব্যক্তিগত ইভেন্টে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যিনি কমপক্ষে একটি স্বর্ণপদক বা ২টি রৌপ্যপদক অথবা ৩টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছেন, তিনি জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন। সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কোনো সংস্থাকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করতে পারবে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা যাবে।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদারের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিমালা চূড়ান্তকরণ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক

সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিবি) ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় দলের ৩জন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছে। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে মুশফিকুর রহিম, ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে মাশরাফি বিন মর্তুজা এবং টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে সাকিব আল হাসান-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে মাশরাফি বিন মর্তুজা অবসর গ্রহণ করলে জাতীয় দলের জন্য এই ফরম্যাটে নতুন অধিনায়ক নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়।

প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 11, May 2017, Tk. 25.00

ধন্য আমি ধন্য মাগো / জন্ম তোমার কোলে
ধন্য সারা বিশ্বময় / তোমার মুখের বোলে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা